সুখ

অন্নদাশঙ্কর রায়

ডি এম লাইব্রেরী
কলকাতা

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৬৮

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

ভূমিকা

অতি প্রাচীন রূপকথার মধ্যে একপ্রকার চিরন্তনতা আছে যা অতি আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেও নেই। দৃশ্যত তা ছেলেদের জন্যে, তবু পড়তে জানলে তার ভিতরে গভীরতম জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যায়। তার ভিতর দিয়ে হস্তান্তরিত হয়েছে পিতৃপিতামহের বিজ্ঞতা। জীবনদর্শনের জন্যেও আমি তার কাছে গেছি।

বহুদিন থেকে আমার সাধ কোনো একটি রূপকথার নির্যাস নিয়ে একালের একটি কাহিনী রচনা করব। সেও হবে একপ্রকার ৲পকথা। এই সাধ থেকে আসে সতেরো বছর আগে লেখা "হাসন সখী" গল্প। তখন হতেই মাথায় ছিল আর একটি কল্পনা। একটু বড় গোছের। এতকাল স্পষ্ট হয়নি বলে লিখিনি। এইবার লিখতে বসে স্পষ্ট হলো। এর নাম রাখলুম "সুখ"।

কিন্তু "সুখ" যদিও রূপকথার নির্যাস দিয়ে গঠিত তবু নিজে একটি রূপকথা নয়। সে অভিলাষ আমার অপূর্ণ রয়ে গেল।

৯ই চৈত্র ১৩৬৭
শান্তিনিকেতন

অন্নদাশঙ্কর রায়

জয়া আর অমিতাভ

দু'জনের হাতে

তরুণ তরুণী,

দুর্লভ এই জীবন

জীবনে মিলন

মিলনে সুখ।

যা পেয়েছ তারে

অর্জন করো বিনয়ে

চির প্রণয়ে

সহাস মুখ।

সুখ

একটি মানুষকে সুখী করা কি সোজা কাজ। আমি তো মনে করি এর চেয়ে একটা সাম্রাজ্য জয় করা সহজ।

কিশোর- বয়সে আমার বিশ্বাস ছিল সবাইকে সুখী করতে পারা যায়। আমি যদি না পারি সেটা আমারি দোষ। বার বার ঠেকে দেখলুম সবাইকে সুখী করা আর যারি সাধ্য হোক আমার তো অসাধ্য। একে একে আর সকলের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে একজনাকেই সুখী করার সাধনায় নিমগ্ন হলুম।

পারলুম কি সেই একজনকেও সুখী করতে। ব্যর্থতা বহন করে যখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসি তখন আমার বয়স বিশের কোটার শেষ সীমানায়। কাউকেই আমি সুখী করতে পারব না। সে বিশ্বাসই আমার নেই।

তা হলে কি আমি আপনাকে সুখী করতে চাইব? না, সেটাও আমার স্বভাব নয়। তাতে আমার আত্মাভিমানে বাধে। আমাকে সুখী করবে আর সকলে। কেউ যদি না করে কাউকেই আমি সাধতে যাব না। কারো উপর রাগও করব না। অপেক্ষা করব। করতে করতে একদিন মরে যাব।

আমি জানি যে, এ জগৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আমার মতো নগণ্য প্রাণীকে সুখী করার জন্যে এত বড়

বিশ্বব্যাপার ফেঁদে বসেননি। তাঁর অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। তাই কোনো দিন তাঁকে ভুলেও প্রার্থনা করিনি যে, প্রভু, আমাকে সুখী কর।

প্রার্থনা যখন করেছি তখন এই বলে করেছি যে, প্রভু, আমাকে সৃষ্টিক্ষম কর, সৃষ্টিতৎপর কর। আমার সামান্য একটুখানি সীমার মধ্যে আমিও যেন তোমারি মতো স্রষ্টা হতে পারি। তেমনি নিন্দাপ্রশংসার উর্ধ্বে। তেমনি ক্রয়বিক্রয়ের অতীত।

আমি আরো জানি যে, দুটো বর বিধাতা কাউকে দেন না। দিলে একটাই দেন। সেইজন্যে ওই একটাই বর প্রার্থনা করেছি। তার উপর যদি বলতুম, হে প্রভু, আমাকে সুখী কর, তা হলে পর পর দুটো বর চাওয়া হতো। বরাবর এমন ভয়ও ছিল যে সুখ বর দিলে তিনি হয়তো সৃষ্টি বর দিতেন না। কিংবা দিয়ে কেড়ে নিতেন। সুখ নিয়ে আমি করতুম কী যদি সৃষ্টি করতে না পারলুম! সুখ যদি আপনা থেকে আসে তা হলে বেশ। যদি আপনা থেকে না আসে তা হলেও বেশ। এলে মাথা পেতে নেব। না এলে হাত পাততে যাব না। বিধাতার কাছেও না।

আমি যে সৃষ্টি বর পেয়েছি এ আমার একমাত্র প্রার্থনার উত্তর।

তুমি সাহিত্যিক, তোমার অভিজ্ঞতা কী রকম, জানিনে। আমি চিত্রকর, আমার অভিজ্ঞতা যদি জানতে চাও তো বলি,

সৃষ্টির পক্ষে হতাশ প্রণয়ের মতো আর কিছু নয়। দেশে ফিরে এসে দিনরাত ছবি আঁকি সর্বগ্রাসী বেদনাকে ভুলতে ও ঢাকতে। ভূতের মতো খাটি শিল্পীহিসাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে ও দশজনের একজন হতে। সুখের কল্পনা একদিনের জন্যেও মনে উদয় হয়নি। তা সত্ত্বেও সুখ মাঝে মাঝে পথ ভুলে এসেছে। বড় কিছু নয়। ছোটখাটো সুখ। ছু'হাত যোড় করে নিয়েছি। কিন্তু একবারও ভুলিনি যে আমাকে সৃষ্টি করে যেতে হবে কী শীত কী গ্রীষ্ম কী বর্ষা কী শরৎ।

কত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘটল। একদিন লক্ষ করি আর্ট একজিবিশনে আমার আঁকা ছবি একদৃষ্টে ধ্যান করছেন বছর পঞ্চাশ বয়সের এক বাঙালী ভদ্রলোক। তাঁর অদূরে এক বাঙালী মহিলা। মহিলার মনোযোগ অন্য একজনের অঙ্কনের উপর ন্যস্ত। এঁদের আমি আগে কোথাও দেখিনি। কৌতূহল জন্মাল। কারা এঁরা? নজরবন্দী করলুম এঁদের। ভদ্রলোক ছবির দাম দেখতে ছু'পা এগিয়ে গেলেন। তার পর মহিলার সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করলেন। তার পর আপিসে গিয়ে খবর দিলেন যে কিনতে চান।

আমি তাঁর ও তাঁর গৃহিণীর অনুসরণ করছিলুম। আপিসে যাঁদের ডিউটি তাঁদের একজন বললেন, "ওই যে, স্বয়ং আর্টিস্ট আপনাদের পিছনে হাজির।"

ভারি খুশি হলেন তাঁরা আমাকে দেখে। আর আমিও

তাঁদের অনুগ্রহ দেখে। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডক্টর ও মিসেস দস্তিদার। দু'জনেই অনুরোধ করলেন আমি যেন একদিন ওঁদের ওখানে আসি। ভদ্রমহিলা বললেন, "আমরা বুধবার সন্ধ্যায় রিসিভ করি।"

আমি বললুম, "আচ্ছা, আমি কোনো এক বুধবার সন্ধ্যার সন্ধানে রইলুম।"

জানতে চাইলুম তাঁদের বাড়ীর ঠিকানা, তাঁদের সঙ্গে চলতে চলতে।

ভদ্রলোক একটা বিখ্যাত রাস্তার নাম করে বললেন, "চোদ্দ নম্বর। মনে থাকবে তো? চোদ্দ পুরুষ। চোদ্দ ভুবন। শিবচতুর্দশী। চতুর্দশপদী কবিতা।"

আমি হেসে বললুম, "এক কথায় মনে রাখতে হলে—সনেট।"

এই বলে তাঁদের তুলে দিলুম তাঁদের মোটরে। তাঁরা বার বার করে বলতে থাকলেন, "আসবেন কিন্তু।" "আসবেন।"

এর পর ছবিখানার তলায় কাগজ এঁটে লিখে দেওয়া হলো "বিক্রী হয়ে গেছে।"

রাস্তার নাম ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। নম্বরও আমার মনে ছিল। কিন্তু বুধবার না গিয়ে আমি বৃহস্পতিবার যাই। বার ভ্রম।

বাড়ী নয়। ফ্ল্যাট। কলিং বেল টিপতেই সাড়া দিল একটি বর্মী মেয়ে। কার্ড পাঠিয়ে দিলুম ভিতরে। দাঁড়াতে হলো না। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে ধরে নিয়ে গেলেন কর্তা স্বয়ং। যেন কতকালের পরিচয়।

"কাল আমরা আপনাকে অনেকক্ষণ প্রত্যাশা করেছিলুম। এলেন না দেখে ধরে নিলুম যে এ সপ্তাহে আপনার সময় হলো না, পরের সপ্তাহে আসবেন। তার পর? ঠিক নম্বর খুঁজে পেয়েছিলেন তো?"

"হাঁ, সার। সনেট আওড়াতে আওড়াতেই এসেছি। কিন্তু বারটা যে বৃহস্পতি নয় বুধ তা তো খেয়াল করিনি। ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। অদিনে এসে আপনাদের জ্বালাতন করছি। দেখুন, আজ বরং আমি ফিরে যাই। বুধবার আসব ঠিক।"

"আরে না, না। তা কি হয়! আর্টিস্টরা ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে বাছা বাছা ভুলগুলিই নিয়েছে। আমাদের জন্যে—বৈজ্ঞানিকদের জন্যে—কিছু রাখেনি। ওঁরা খেতে বসেছেন। আসুন, আপনাকে খাবার ঘরে নিয়ে যাই।"

ভেবেছিলুম গৌরবে বহুবচন। তা নয়। খাবার টেবলে আরো একজন ছিলেন। দস্তিদার দম্পতীর একমাত্র কন্যা—একমাত্র সন্তান।

মালাকে তুমি তার ষোল বছর বয়সে দেখনি। আমি দেখেছি। আমার পরম সৌভাগ্য। ও বয়সে ও যা ছিল

তা অবর্ণনীয়। আমি তো সাহিত্যিক নই। ভাষায় বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়। তুলি দিয়ে করতে পারতুম হয়তো। সে রকম একটা প্রস্তাবও ওঁদের দিক থেকে এসেছিল কিছুদিন পরে। রাজী হইনি কেন, জানো ?

আচ্ছা, বলছি। তার আগে বলি সেদিন খাবার ঘরে কী হলো। ওঁরা আমাকে জোর করে টেবিলে বসিয়ে দিলেন। মালার মুখোমুখি। খাব না, খাব না করে খেলুম সবই। বরং অপরের চেয়ে বেশী করেই খেলুম। ছবি আঁকার সময় ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। তার পর এমন খিদে পায় যে ভদ্র ও ভদ্রাদের সঙ্গে বসে অভদ্রের মতো গিলি। ভাগ্যিস্ ওঁরা পান করেন না। পানীয় সামনে রাখেননি। নইলে সেদিন আমার উপর ওঁদের ঘেন্না ধরে যেত।

ডক্টর দস্তিদার বৈজ্ঞানিক হলেও সেকালের ঋষিদের মতো গভীর দৃষ্টিমান। কিছুক্ষণ একসঙ্গে কাটালেই বোঝা যায় ইনি প্রাচীন ভারতের কণ্বমুনি আর এঁর কন্যাটি আশ্রমকন্যা শকুন্তলা।

মালা না হয়ে ওর নাম হওয়া উচিত ছিল মিরান্দা। সরলতার, নিরীহতার নিখুঁত প্রতিমূর্তি। আজন্ম বর্মায় মানুষ। এই এক বছর আগে কলকাতা এসেছে। প্রধানত ওর জন্যেই ওর মা-বাবাকে বর্মা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। নইলে আরো বছর দশেক চাকরি করতে পারতেন দস্তিদার। অসময়ে পেনসন নিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে কি তাঁর

সাহস হতো? কিন্তু মালার মা পাঁচ বছর ধরে তাগিদ দিচ্ছিলেন যে তাঁকে তাঁর তপোবন ছেড়ে লোকালয়ে ভাগ্য-পরীক্ষা করতে হবে।

উদ্যানবেষ্টিত তপোবনের মতো ভবন। হরিণ চরে বেড়ায়। লোকলস্কর পশুপাখীতে জমজমাট। প্রকৃতির কোলে লালিত হয় তাঁর মালা। তাঁর শকুন্তলা বা মিরান্দা। প্রকৃতির কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে নেবার কথা ভাবতে কি তাঁর মন চায়? থাকুক না আরো কয়েক বছর। কী এমন বয়স হয়েছে! কিন্তু জননী নিষ্ঠুর। মেয়ের বিয়ে দিতে হলে আগে থেকে সেই ভাবে তৈরি করতে হবে। রেঙ্গুনে রেখে সে ভাবে তৈরি করা যায় না। "হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে" বলে নাকি একটা গান আছে। সেটা গাইতে শেখা চাই। "নৃত্যের তালে তালে" নাচতে শেখা চাই। নইলে ভালো বিয়ে হয় না। আর ভালো বিয়ে না হলে মেয়েমানুষের জীবন মাটি। বাপ মা তো চিরদিন বাঁচবে না। তখন ও মেয়ের কপালে দুঃখ আছে। যদি না—

সেদিন অতটা আঁচ করিনি। পরে একটু একটু করে বুঝতে পেরেছিলুম যে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে মা বাবার দু'জনের দু'রকম পরিকল্পনা ছিল। বাপ পনেরো বছর নিজের ইচ্ছা খাটিয়েছেন, আর পারেননি, হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এখন মায়ের ইচ্ছা খাটছে। রেঙ্গুনের সঙ্গে দস্তিদারের সম্পর্ক পঁচিশ বছরের। সেখানে তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। সকলেই

তাঁর নাম জানে, তাঁকে ভক্তি করে। কলকাতায় তিনি কে? অত বড় বাড়ী তাঁকে দেবে কে? বাগান তাঁকে দেবে কে? কায়ক্লেশে মাথা গুঁজে পড়ে আছেন এলগিন রোড অঞ্চলের একখানা ফ্ল্যাটে। আসবাবপত্র জলের দরে বিক্রী করে দিয়ে এসেছেন। সঙ্গে এনেছেন ওই মোটরটি আর ওই বর্মী আশ্রিতাটি। মালার বাল্যসখী। বাড়ীর কাজকর্মে সাহায্য করে।

"জীবনকে নতুন করে আরম্ভ করতে হবে। এই ভেবে ভেবে জীবন গেল আমার।" বসবার ঘরে আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে মৃদু স্বরে বললেন ডক্টর দস্তিদার।

আমার দৃষ্টি তখন মালার অনুসরণ করছে। সারা ইউরোপে এ রকম মেয়ে আমি একটিই দেখেছি। এক হাঙ্গেরিয়ান আর্টিস্টের কন্যা। যেন এ জগতের নয়। মাটি দিয়ে নয়, আকাশ দিয়ে গড়া। তার একটি দেখলুম এত দিন বাদে আমার স্বদেশে। এদের আঁকা খুবই কঠিন। বিশেষত আমাদের মতো আধুনিক শিল্পীদের পক্ষে। আমরা শরীরের অ্যানাটোমি শিখি। তাই যথেষ্ট নয়। মডেল সামনে রেখে বার বার দেখি, বার বার মিলিয়ে নিই। এই তো আমাদের শিক্ষা। আমাদের যদি যীশুজননী মেরী আঁকতে বলা হয় তো আমরা সাত হাত জলে পড়ি। সে পবিত্রতা আমরা পাব কোথায়? কার কাছে? ও সব বিষয়ে আমরা হাত দিইনে। নিজেদের অক্ষমতা ঢাকি এই বলে যে, ও সব এখন সেকেলে।

ওর মধ্যে নূতনত্ব নেই। পবিত্রতাকেও হেসে উড়িয়ে দিই। মাতৃত্বের মাধুরী আমাদের স্পর্শ করে না। নারীর দেবীত্ব আমাদের চোখে পড়ে না। তাই এলিজাবেথকে আঁকিনি। মালাকেও না।

সেদিন বসবার ঘরে দেখি আমারি আঁকা সেই প্রদর্শনীর ছবি। তারিফ করলেন মিসেস দস্তিদার। বললেন, "দার্জিলিঙের লেপচা মেয়ের ছবি তো এমন সুন্দর হয় না। একে আপনি কোথায় দেখলেন জানতে ইচ্ছা করে।"

আমি ফস করে জবাব দিলুম, "ঘুম ছাড়িয়ে টাইগার হিলের পথে।"

তিনজনেই ওঁরা সরলবিশ্বাসী। আমার কথা বিশ্বাস করলেন। কিন্তু সেই যে একবার ধরা পড়ে গেলুম তারপর থেকে আমি অতি সতর্ক। মালার ছবি আঁকলে সেই প্রশ্নই ঘুরে ফিরে শুনতে হতো। আসলে যা হয়েছিল তা তুমি নিশ্চয় অনুমান করেছ। লেপচা মেয়ে আমি টাইগার হিলের পথে না হোক দার্জিলিঙের পথে ঘাটে দেখেছি। কিন্তু ছবি আঁকতে গিয়ে যা ঘটল তা আমার নিজের চোখও বিশ্বাস করতে চায় না। সাদৃশ্য ফুটল আর একটি মেয়ের। যার ছবি রাশি রাশি এঁকেছি। হাঁ, প্যারিসের মেয়ে। প্যারিসিয়েন। প্রিয়দর্শনা ওদিল।

কথায় কথায় বললুম, "আমিও আপনাদের মতো এক বছর হলো ফিরেছি। প্যারিসের রেশ এখনো মিলিয়ে যায়নি।

অসম্ভব নয় যে অজান্তে বিদেশিনীর আদল এসে পড়েছে। ছিলুমও তো বড় কম দিন নয়। লণ্ডনে দুই আর প্যারিসে পাঁচ বছর।"

"ওঃ! তাই নাকি?" দস্তিদারের কৌতূহল উজ্জীবিত হলো। "কত কাল দেখিনি। মহাযুদ্ধের দু' বছর আগে আমি ইংলণ্ড থেকে সরাসরি বর্মায় পাড়ি দিই। বেশীর ভাগ সময় কেম্‌ব্রিজেই কাটিয়েছি। ছুটিতে কন্টিনেণ্টে বেড়িয়েছি। হাঁ, প্যারিসেও গেছি। ফরাসীরা হলো জাত বিপ্লবী। তাদের ভিতরে আগুন আছে। অমন একটা বিপ্লব কি আর কোনো জাত বাধাতে পারত? আপনারও কি তা মনে হয়নি?"

মানলুম। বললুম, "জাত বিপ্লবী না হোক ধাত বিপ্লবী। কিন্তু ওদের মুশকিল হয়েছে এই যে ইতিহাস ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। এখন বিপ্লব বলতে বোঝায় রুশবিপ্লব। ফরাসীবিপ্লব নয়। সকলের নজর রাশিয়ার উপরে। ফ্রান্সের উপর কারো নজর নয়। বিপ্লব ওরা অবশ্য যে-কোনো দিন ঘটাতে পারে। সে শক্তি ওরা রাখে। কিন্তু ঘটনার স্রোত কি সেইখানেই থামবে? ঘটিয়ে তুলবে রুশবিপ্লব। তখন না থাকবে লিবার্টি, না থাকবে প্রপার্টি। ফরাসীদের যে-দুটি না হলেই নয়। সেইজন্যে বিপ্লবকে যদিও ওরা অন্তরে অন্তরে ভালোবাসে তবু বিপ্লবকেই ওরা হাড়ে হাড়ে ডরায়। ওদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান কোনো দিন হবে না।"

দস্তিদার বললেন, "মহাযুদ্ধের আগে এ রকম তো দেখিনি।"

আমি বললুম, "না, মহাযুদ্ধের আগে এ রকম ছিল না। এ পরিস্থিতি যুদ্ধোত্তর যুগের। আমরা প্রথমে ভেবেছিলুম যুদ্ধের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। তা নয়। এখন রোগনির্ণয় হয়েছে। এটা বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায় নয়, রুশবিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়। যতদিন না সেন নদীর তীরে আর একটা রুশবিপ্লব ঘটছে ততদিন এর সমাপ্তি নেই। কিন্তু তা তো কেউ প্রাণ থাকতে ঘটতে দেবে না। কাজেই এ রোগের প্রতিকার নেই।"

মিসেস দস্তিদার নীরবে শুনছিলেন। বললেন, "না থাকাই ভালো। লিবার্টি আর প্রপার্টি বাদ দিলে জীবনে আর বাকী থাকে কী? আপনার ওই আর্ট কদ্দিন থাকবে? আর এঁর এই সায়েন্স কদ্দিন থাকবে?"

আমি নিজেও তাঁরই মতো সন্দিহান। তা হলেও আমাকে বলতে হলো, "আর্ট কদ্দিন থাকবে, এ প্রশ্ন তো আজকেও করা যায়। ফরাসীরা বিপ্লবের নেশা ছাড়বে না। ওটা ওদের জীবনের অঙ্গ। ও না হলে ওরা ফরাসীই নয়। অথচ বিপ্লব মানে তো সর্বনাশ। তাই ওরা করছে কী, না বিপ্লবের স্বাদ আর্টে খুঁজছে। জীবনে যা ঘটানো গেল না তা আর্টে ঘটাবে। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবে। ব্যবহারিক জগতে তার মূলও নেই, তার ফুলও নেই। তা হলে বেঁচে থাক ওরা ওদের লিবার্টি আর প্রপার্টি নিয়ে। তাও পারছে কোথায়? অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জর। ভিতরে ভিতরে অসুস্থ।"

সেদিন আরো অনেক গল্প হলো। কলকাতা শহরে ওঁরাও নবাগত, আমিও নবাগত। আমার কেবল সাত বছর ইউরোপে নয়, চার বছর লক্ষ্ণৌয়ে কেটেছে। উভয় পক্ষে একটা যোগসূত্র পাওয়া গেল। সেটা নবাগতের প্রতি নবাগতের সহানুভূতি। ওঁরা বললেন, "বুধবার-বুধবার তো আসবেনই। তা ছাড়াও যখন আপনার খুশি।"

যখন খুশি অবশ্য যাওয়া যায় না। সাত দিনে একদিন যেতে হলেও বুধবারগুলোর হিসাব রাখতে হয়। আমি বেহিসাবী মানুষ। বুধবার যে কেমন করে পেরিয়ে যায় আমার খেয়াল থাকে না। পরে আবিষ্কার করি। মাসে হয়তো একবার হাজিরা দিই। ওঁরা অনুযোগ করেন। আমি অজুহাত দেখাই।

এমনি করে ও বাড়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। কবে এক সময় ওঁরা আমাকে তুমি বলতে আরম্ভ করেন। আর আমিও ওঁদের মাসিমা ও মেসোমশায় বলে ডাকতে শুরু করি। ভেবেছিলুম দাদা বৌদি বলে ডাকব। কিন্তু তা হলে মালার কাকাবাবু বনতে হয়। তাতে আমার অরুচি। আমি ওর দাদা হতে পারলেই সুখী হই।

তা বলে ওর প্রতিকৃতি আঁকতে সম্মত নই। জানি ব্যর্থ হব। মাসিমা যখন অনুরোধ করলেন আমি বললুম, "মাসিমা, মালা আপনার চক্ষের মণি। আমার কাছেও কম আদরের নয়। কিন্তু আর্টের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি দয়ামায়ার ধার

ধারেন না। আর্ট সেদিক থেকে বিজ্ঞানেরই মতো নির্মম। মালার ছবি দেখে আপনি হয়তো চমকে উঠবেন। কৈফিয়ৎ দাবী করবেন। কী কৈফিয়ৎ আমি দেব? লেওনার্দোকে লোকে চার শতাব্দী ধরে ছুষছে। মোনা লিসার ভুরু নেই কেন? তবু তো তখনকার দিনে প্রতিকৃতি ছিল মোটের উপর অনুকৃতি। এখন ফোটোগ্রাফির যুগে পাছে আমাদের কেউ ফোটোগ্রাফার বলে সেই ভয়ে আমরা অনুকৃতির ছায়া মাড়াইনে। আপনি হয়তো বলবেন বিকৃতি।"

মাসিমা শিউরে উঠলেন। "তা হলে কাজ নেই এঁকে।"

আমি বললুম, "তার চেয়ে আপনি কোনো ভালো ফোটোগ্রাফারকে দিয়ে ওর পোর্ট্রেট করান। আজকাল ফোটোগ্রাফির আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে। হাতে আঁকার মতোই দেখতে। অথচ অবিকল সেই মানুষটি। সেই মোনা লিসা, সেই ভুরু দুটি।"

"কিন্তু সেই হাসিটি নয়।" বাধা দিলেন মেসোমশায়।

"আহ্! সেই হাসিটি নয়।" আমি দুই হাত তুলে টেবিলে তাল দিয়ে বললুম, "সেই হাসিটি নয়। কিন্তু সে হাসির আবার রকমারি অর্থ করা হয়। কেউ কেউ বলে ওটা শয়তানি হাসি। দেখুন দেখি, লেওনার্দোর পাল্লায় পড়ে কী বদনাম হয়েছে বেচারির। এই বা কী! এল গ্রেকোর হাতে গ্র্যাণ্ড ইন্‌কুইজিটর মহোদয়ের কী দশা হলো জানেন তো।

তখনকার দিনে কেউ টের পায়নি—স্বয়ং গ্র্যাণ্ড ইন্‌কুইজিটরও না— যে, এল গ্রেকো ভাবী কালের জন্যে একটি ভয়াবহ দলিল সম্পাদন করে যাচ্ছেন। ইন্‌কুইজিটরের আত্মা সেখানে উলঙ্গভাবে উদ্‌ঘাটিত। অথচ বাইরে কেমন ধর্মের ভড়ং। সাক্ষাৎ মহাসাধু।”

মেসোমশায় আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, “ওহে দেবপ্রিয়, তা হলে তুমি এক কাজ কর। তুমি আমার ছবি আঁক।”

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, না, সার। কিন্তু মাসিমা আমার কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, “না, বাবা, তোমাকে আঁকতে হবে না। সুনামের সঙ্গে সারাজীবন কাটিয়ে এসে শেষকালে তোমার খপ্পরে পড়ে কী যে চেহারা খুলবে অধ্যাপকের! লোকে বলবে জংলী না বুনো! তা নেহাৎ ভুল বলবে না বোধ হয়।”

সে সময় আমি জানতুম না যে ওঁদের দু'জনের মধ্যে একটা আড়াআড়ি চলছিল। একটু একটু করে আবিষ্কার করি। একদিনে নয়, একজনের মুখ থেকে শুনে নয়। মাসিমা বহুকাল সহ্য করে এসেছেন, আর পারছেন না। বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে তো। কর্তা গাছপালা নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করতে চান করুন যত খুশি। কিন্তু মানুষ তো উদ্ভিদ্ নয়। আর সে তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে কি তার অসহায়তার সুযোগ নিতে হয়! মাসিমা স্বামীকে পুত্র উপহার দিতে পারেননি বলে মনে মনে অপরাধী বোধ

করতেন। তাই মালার বেলা পিতার ইচ্ছায় কর্ম মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে।

দেখে বিশ্বাস হয় না যে মেসোমশায় ছিলেন স্বদেশীযুগে সন্ত্রাসবাদীদের দলে। তাঁর বাবা সে কথা জানতেন না। যেদিন জানতে পেলেন সেদিন সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে বিলেত পাঠানোর আয়োজন করলেন। তিনি তখন এম এ পড়ছিলেন, বিলেত গিয়ে কেম্‌ব্রিজে পড়তে হবে শুনে আনন্দে অধীর। কিন্তু একটা শর্ত ছিল। বিয়ে করে যেতে হবে। তাঁর তাতে ঘোরতর আপত্তি। তখন একটা রফা হলো। বিবাহ নয়, বাগ্‌দান। মাসিমা তখন ভগিনী নিবেদিতার স্কুলের ছাত্রী। নিবেদিতার প্রিয়পাত্রী। বাগ্‌দান তাঁকে স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার সময় দিল। তার পরে মেসোমশাই বলে পাঠালেন তিনি ডক্‌টরেট না নিয়ে ফিরবেন না। মাসিমাকে আরো দু'বছর অপেক্ষা করতে হলো। সে দু'টো বছর তিনি তাঁর ভাবী স্বামীর নির্দেশে বেথুন কলেজে পড়েন। তখনকার দিনে ব্রাহ্ম সমাজের বাইরে সেটা একটু অসাধারণ।

বিলেতের জলহাওয়ায় মেসোমশায়ের সন্ত্রাসবাদ সেরে যায়। তা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে বাংলাদেশে চাকরি করা নিরাপদ হতো না। টিকটিকি তো পিছনে লাগতই, দাদারাও তাঁকে ছাড়তেন না, অন্তত চাঁদাটা আদায় করতেন! তাই তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যান। মাসিমা কী আর করেন! সীতার মতো অনুগতা হন। রেঙ্গুনের কাজে যোগ দিয়ে তার পরে

এক সময় কলকাতা এসে মেসোমশায় বিয়ে করে মাসিমাকে নিয়ে যান। সেখানে ওঁরা সুখেই ছিলেন। একমাত্র দুঃখ ওঁদের সন্তানভাগ্য আশানুরূপ হয়নি। আশা ছিল তিন ছেলেমেয়ের মা বাপ হবেন। তাদের নাম রাখবেন অরুণ বরুণ কিরণমালা। অরুণ বরুণ তো এলোই না। কিরণমালা এলো দশ বছর বাদে। ততদিনে কিরণমালা নামটা সেকেলে হয়ে গেছে। তাকে ছেঁটে ছোট করা হলো, যাতে আধুনিকদের মনে ধরে। মালা বলে নামকরণ হলো মেয়ের।

মেসোমশায়ের বাবা বিশ্বাস করতেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ তার অতীতের পুনরাবর্তন। তিনি ছিলেন তপোবনের পক্ষপাতী, তপোবনে বালকদের আবাসিক শিক্ষার পক্ষপাতী। মেসো-মশায়ের বাল্যকালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তাঁর বয়সটা ততদিনে আশ্রম বিদ্যালয়ের বয়ঃসীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই তাঁর মনে একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। তপোবনের প্রতি অনুরাগ ও সন্ত্রাসবাদের প্রতি আকর্ষণ এক স্তরের নয়। একটা সুগভীর, অন্যটা অগভীর। বিলেত থেকে ফিরে আসার পরও তিনি তপোবনের চিন্তায় বিভোর থাকেন। তবে সেকালের তপোবন ও একালের তপোবন একই রকম হতে পারে না। বল্কল পরিধান, সমিধ সংগ্রহ, অগ্নিহোত্র ও বেদমন্ত্র পাঠ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য পুত্রকন্যাকে জননীর কোল থেকে নিয়ে প্রকৃতির কোলে তুলে দেওয়া। কিন্তু প্রকৃতি বলতে বনজঙ্গল বোঝায় না, যেখানকার অধীশ্বর পশুরাজ।

প্রকৃতি বলতে বোঝায় তপোবন, যেখানকার কুলপতি মহর্ষি। মহর্ষিরও বাঁধাধরা সংজ্ঞা নেই। তিনি বৈজ্ঞানিকও হতে পারেন আইনস্টাইনের মতো। ধন্বন্তরিও হতে পারেন সোয়াইটসারের (Schweitzer) মতো। তিনি নিরীশ্বরবাদী হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু তপস্যা তাঁকে করতে হবেই। করতে হবে আলোর জন্যে, ভালোর জন্যে, যার জন্যে হট্টগোল থেকে অপসরণ না করে উপায় নেই।

একমাত্র কন্যাকে মেসোমশায় অন্য কোনো ঋষির তপোবনে পাঠাননি, নিজের কাছে রেখে নিজেই তার জন্যে তপোবন গড়ে তুলেছিলেন। নিজেই হতে চেয়েছিলেন কুলপতি ঋষি। ও মেয়ে জলে ভিজেছে, রোদে পুড়েছে, ঝড়ঝাপটায় ঘরে বন্ধ থাকেনি। ও মেয়ে খালি পায়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, প্রত্যেকটি ফুল পাতা চিনেছে, পাখী পুষেছে, গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি উৎপন্ন করেছে। বীজ বুনেছে, গাছ লাগিয়েছে, বাগান করেছে। লেখাপড়াও শিখেছে। গান গেয়েছে। ছবি এঁকেছে। মূর্তি গড়েছে। আবার ঘরকন্নার কাজও করেছে। ঝি চাকরের উপর নির্ভর করেনি। তাদের সঙ্গে ব্যবধান রক্ষা করে চলেনি। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা তিনি তার মূল্যবোধকে উচ্চ গ্রামে বেঁধেছেন।

কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য, কোন্‌টা সার কোন্‌টা অসার, কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য, কোন্‌টা ন্যায় কোন্‌টা অন্যায়, কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা শ্রেয় কোন্‌টা

প্রেয়, কোন্‌টা ধ্রুব কোন্‌টা অধ্রুব, কোন্‌টা সুন্দর কোন্‌টা অসুন্দর, এ নিয়ে মালার সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনা গল্পসল্প ওর আট ন'বছর বয়স থেকেই। মালাকেও তিনি নিজের যুক্তি খাটাতে বলতেন, নির্বিচারে মেনে নিতে বলতেন না। এমনি করে মালার শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল। উপনিষদের ঋষিকন্যাদের মতো।

ঋষিকন্যাদের মতো মালারও একদিন বিবাহ হবে, মেসোমশায় তা জানতেন। ও যখন সাবালিকা হবে তখন কেউ যদি ওকে প্রার্থনা করে তখন প্রার্থনা পূরণ করবে কি করবে না সেটা ও নিজে স্থির করবে। তখন পরামর্শ চাইলে পরামর্শ দেওয়া যাবে, সাহায্য চাইলে সাহায্য করা যাবে। কিন্তু বিবাহের জন্যে উপযাচিকা হওয়া ওর দিক থেকে যেমন অবমাননাকর ওর পিতামাতার দিক থেকেও তেমনি। কেনই বা তাঁরা বরপক্ষের দ্বারে উপযাচক হয়ে দাঁড়াবেন! মালা যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো তা হলে কি কন্যাপক্ষের দ্বারস্থ হতেন? আর মালারও কি আত্মসম্মান নেই? মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে কি ওর আত্মা নেই? বর্মী মেয়েদের দেখে শিখুক কেমন করে নিজের মান নিজে রাখতে হয়। তথাকথিত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে বিকিয়ে দিতে হয় না।

ওদিকে মৈত্রেয়ীর মতো মাসিমার কেবল একটিমাত্র জিজ্ঞাসা। "যা দিয়ে আমার মেয়ে সুখী না হবে তা নিয়ে আমি কী করব?" তাঁর মতে সেই হচ্ছে বিদ্যা যা ভালো বিয়ের জন্যে। ভালো

বিয়ে দাও, দেখবে মেয়ে চিরজীবন সুখী হবে। মেয়ের জন্মের পর থেকেই তাঁর মাথায় ঘুরছে কবে কেমন করে এ মেয়ের ভালো বিয়ে হবে। মেসোমশায়ের কাছে মালা ব্যক্তিবিশেষ। তার অবাধ বিকাশ পূর্ণ বিকাশ হলো কাম্য। বিবাহ যেমন পুরুষের হয় তেমনি নারীরও হবে, কিন্তু ব্যক্তিগত পূর্ণতাটাই আসল। আর মাসিমার কাছে মালা মেয়েছেলে। বেটাছেলে নয়। মূলে ভুল হবে যদি তাকে বেটাছেলের মতো করে মানুষ করা হয়। গোড়া থেকেই মেনে নিতে হবে যে একদিন একটি সুপাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। বিয়ে হবে বনে নয়, গ্রামে নয়, বর্মায় নয়, কলকাতা শহরে, বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে। সম্ভবত বনেদী একান্নবর্তী পরিবারে। তা হলে সেই অনুসারেই তাকে প্রস্তুত করতে হয়। শ্বশুরশাশুড়ী কেমনটি চান, তাঁদের ছেলে কেমনটি চায়, দেওর ননদ কেমনটি চায় এইটেই আসল। চাহিদা যাতে মেটে সেইটেই কাম্য। তাতেই সুখ, কারণ তাতেই নিরাপত্তা। নারী চায় নিরাপত্তা। আর সব তো অলঙ্করণ।

মেয়ে যতদিন হয়নি ততদিন রেঙ্গুনে তাঁরা বেশ নিশ্চিন্তেই ছিলেন। স্থানান্তরের কথা চিন্তা করেননি। মালার যখন স্কুলে যাবার বয়স হলো মাসিমা বললেন, চল, কলকাতা যাই। বদলি কি কলকাতায় হয় না? হয়, হয়, চেষ্টাচরিত্র করলে হয় বইকি। নজীর আছে। মেসোমশায় বললেন, চেষ্টাচরিত্র মানে তো ধরাধরি। মোসাহেবী। সেটি আমাকে দিয়ে

হবে না। আমি কাজ পেয়েছি যোগ্যতার জোরে, বর্মা বেছে নিয়েছি খোলা চোখে। বর্মা না চেয়ে বেঙ্গল চাইলে তখনি তা পাওয়া যেত। কেন চাইনি তা তো তুমি জানো। সন্ত্রাসবাদ একটুও কমেনি। কমলে পরে তখন দেখা যাবে।

মাসিমা কী আর করেন! স্বামীকে দণ্ডকারণ্যে ফেলে অযোধ্যায় ফিরে যেতে পারেন না। ভাগ্যিস্ এ সমস্যা সীতার জীবনে উদয় হয়নি। মাসিমার আত্মীয়রা তাঁকে লিখেছিলেন, তুই তোর মেয়েকে নিয়ে এখানে চলে আয়, বুড়ি। তারপর কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনি মেয়ের বাপও আসবে। মাসিমা তাতে রাজী হননি। স্বামীকে তিনি একদিনের জন্যেও ত্যাগ করেননি। কিন্তু মালার জন্যে অনবরত মন খারাপ করেছেন। বিয়ে অবশ্য কম বয়সে দিতে ইচ্ছা নেই। কিন্তু বিবাহের প্রস্তুতি অল্প বয়স থেকেই শুরু করতে হয়। ব্রত উপবাস লক্ষ্মীপূজা শিবপূজা এসব দিয়েই শুরু। তারপর বিয়ে না হয় দু'দিন পরে হবে, না হয় আঠারো বছর বয়সে, কিন্তু বিয়ের নির্বন্ধ দু'দিন আগে হলেই বা ক্ষতি কী! এই ধরো এগারো বারো বছর বয়সে। গরিবের ছেলেকে বেঁধে রাখতে হয় মেডিকাল কলেজে বা এনজিনীয়ারিং কলেজে পড়িয়ে। কিংবা বিলেত পাঠিয়ে। বড়লোকের ছেলেকে বেঁধে রাখতে হয় সম্পত্তির আশা দিয়ে। সময় থাকতে কলকাতায় বসে খোঁজ খবর না রাখলে ভালো ভালো পাত্রগুলি সব বেহাত হবে। পড়ে থাকবে নিরেস মাল। সময় ও জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না।

রেঙ্গুনের স্কুল মাসিমার মনে ধরেনি। ওখানকার শিক্ষা বাঙালীর মেয়েকে বাঙালী সমাজে খাপ খাওয়াতে অক্ষম। চিরটা কাল তাকে বেখাপ হয়ে থাকতে হবে। তার চেয়ে বাড়ীতে প্রাইভেট পড়া ভালো। তা বলে বাড়ীটাকে তপোবন করে তোলার মর্ম তিনি বোঝেন না। লোকালয়েই যাকে বাস করতে হবে বরাবর তাকে লোকালয়ের উপযুক্ত করে মানুষ করতে হয়। তপোবন থেকে লোকালয়ে গিয়ে সে কি জলের মাছ ডাঙায় সাঁতার কাটবে? আর ওই যে ভালো মন্দ ন্যায় অন্যায় সত্য অসত্যের চুলচেরা সন্ধিবিচ্ছেদ ও কি ব্যবহারিক জীবনের ধোপে টিকবে? বেঁচে থাকতে হলে আপোস করতে হয়। মুনি ঋষিরাও নিখুঁত ছিলেন না। সংসারে টিকে থাকতে হলে অনেক অনাচার অত্যাচার চোখ বুজে হজম করতে হয়। বিশেষ করে মেয়েমানুষকে।

অবশেষে বর্মা স্বতন্ত্র হলো। মেসোমাশায়ের মনে হলো বর্মার লোকের মতো তিনিও ভারতের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছেন। তাঁকেও মনঃস্থির করতে হবে। কোন্‌টা তাঁর স্বদেশ? ভারত না বর্মা? বর্মাকে তিনি প্রাণভরে ভালোবাসতেন, কিন্তু তার জন্যে তিনি ভারতের প্রতি আনুগত্য হারাতে রাজী ছিলেন না। তা হলে বর্মায় তাঁকে বিদেশীর মতো বাস করতে হয়। তাতেও তিনি নারাজ। রেঙ্গুন থেকে বদলি হওয়া সম্ভব ছিল না। পেনসন নেওয়া সম্ভব ছিল। তিনি দেখলেন সেই ভালো। তারপর গৃহিণীর ইচ্ছায় কর্ম। কলকাতায়

সংসার পেতে বসা। আপাতত ফ্ল্যাটে। পরে নতুন তৈরি নিজের বাড়ীতে। তারপর মনের মতো কাজ যদি জুটে যায় করবেন। নয়তো জীবনটাকে নতুন করে গুছিয়ে নেবেন। সেটাও তো একটা কাজ। বরং সেইটেই সব চেয়ে গুরুতর কাজ। তার জন্যে অবশ্য মজুরি মেলে না। নাই বা মিলল। জীবন তো জীবিকা নয়।

মেয়ের বিয়ের কথা ভেবে মাসিমা চরকীর মতো ঘোরেন। আর মেয়ের বিকাশের কথা ভেবে মেসোমশায় বই কেনেন, ছবি কেনেন, রেকর্ড কেনেন, চারাগাছ কেনেন। তবে মাসিমার যেমন সেই একমাত্র ভাবনা মেসোমশায়ের তেমন নয়। তাঁর সঙ্গে কথা বললে তিনি সেজান, মাতিস্, পিকাসো নিয়ে মেতে থাকেন, আশ্চর্য তাঁর কৌতূহল ও গ্রহিষ্ণুতা। কিন্তু হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন আর বলেন, "নতুন করে আরম্ভ করতে চাই, কিন্তু কোন্খান থেকে যে আরম্ভ করি! পুরাতন করে চাকরি করাই কি নতুন করে আরম্ভ!"

অফার পেয়েছিলেন দু'চার জায়গা থেকে। বললেন, "থাক, কাজ নেই যুবকদের অন্ন মেরে। ওরা বেকার থাকলে ওদের মন ভেঙে যাবে। আমি বেকার থাকলে আমার তেমন কোনো আশঙ্কা নেই। তবে, হাঁ, চর্চার অভাবে যেটুকু শিখেছি সেটুকু ভুলে যেতে পারি। কাজ যদি হয় এমন কোনো কাজ যা যুবকদের দিয়ে হবার নয়, যার জন্যে প্রার্থীও নয় তারা, তা হলে বিবেচনা করতে পারি।"

গৃহিণী তা শুনে রাগ করেন। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে! বসে বসে খেলে কুবেরের ধনও ফুরোয়। পেনসনের টাকায় তো কুলোয় না। পুঁজি ভাঙতে হয়। তা হলে মেয়ের বিয়ে হবে কী দিয়ে?

তখন কর্তা বলেন, "মালার বিয়ের সময় হলে আমি স্বয়ংবর সভা ডাকব। দেখবে কত রাজপুত্তুর আসে। মালা তাদের একজনের গলায় মালা দেবে। সেই মাল্যবান হবে সবার চেয়ে ভাগ্যবান।"

দুই

দস্তিদারদের নতুন বাড়ী তৈরি হয়েছিল। গৃহপ্রবেশের দিন তাঁরা আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন আমার বোন নীলিমাকেও যেন নিয়ে যাই। সেদিন নীলির সঙ্গে মালার আলাপ হয়। আলাপ ক্রমে বন্ধুতায় পরিণত হয়।

বণ্ডেল রোডের এই নতুন বাড়ীতে মেসোমশায় নবীন উদ্যমে তপোবন রচনা করছিলেন। বহুকালের পুরোনো গাছ ছিল অনেকগুলি। গাছের গোড়ায় বেদীনির্মাণ হলো। নতুন গাছ লাগানো হলো যাতে সুদূর ভবিষ্যতে পুরোনো গাছের অভাব পূর্ণ হয়।

"এটাও একটা কাজের মতো কাজ। এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। আমি দেখতে পাব না। তাতে কিছু আসে যায় না। পরে যারা আসবে তারা দেখলেই আমারও দেখা হবে। কী বল, দেবপ্রিয় ?" মেসোমশায় আমার সমর্থন আশা করলেন।

আমি বললুম, "আপনাকে আমরা অনায়াসেই আরো ত্রিশ বছর পাচ্ছি। যেমন শরীরের গাঁথুনি আর নিয়মনিষ্ঠ জীবন ত্রিশ কেন চল্লিশ বছর।"

তিনি আমার দুই কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, "এসব গাছ বনস্পতি হতে অনেক বেশী সময় নেয়। এ যেন অজন্তার

গুহাচিত্র। একখানা আঁকতে তিন পুরুষ লেগে যায়। এ তোমাদের আধুনিক চিত্রকলা নয় যে তিন দিনে একখানা সারা হবে। রাগ কোরো না। তোমাকে লক্ষ্য করে বলিনি।"

"বললেও আমি রাগ করতুম না, মেসোমশায়। কথাটা আমার বেলাও খাটে। তিন দিনে একখানা না হোক তিন মাসে একখানা আঁকা না হলে মনে হয় বৃথাই বেঁচে আছি। আর সবাই জোর কদমে এগিয়ে গেল। আমিই ঘোড়দৌড়ের শেষ ঘোড়া।"

তিনি আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন, "খরগোস-দৌড়ের শেষ কচ্ছপ।"

ইতিমধ্যে তিনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছিলেন আমার আরো খানকয়েক ছবি কিনে। কেন যে কিনলেন তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি তো ইণ্ডিয়ান আর্ট বা ভারতীয় ঐতিহ্যের ধার ধারিনে। একবার বলেওছিলুম ও কথা।

তিনি বলেছিলেন, "তুমি সচেতনভাবে ভারতীয় শিল্পী নও। কিন্তু তোমার সৃষ্টি যে উৎস থেকে রস আকর্ষণ করছে সেটা ভারতেরই গঙ্গোত্রী। শুধু পদ্ধতিটা পাশ্চাত্য। তুমি শত চেষ্টা করলেও সেজানের রসের উৎস আবিষ্কার করতে পারবে না, মাতিসেরও না। ওঁদের কতকগুলো প্রবলেম আছে। সেসব প্রবলেম আঙ্গিকের বলে ভ্রম হয়। কিন্তু ওর ভিতরে আরো কথা আছে। যন্ত্রযুগের সঙ্গে ওঁরা একটা বোঝাপড়া করতে

চান। তোমার কাছে এখনো সেসব সত্য হয়নি, কারণ ভারতের পক্ষে সত্য হয়নি।"

একজন বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে আর্ট শিখতে হবে আমাকে! হা ভগবান! যে আমি অত যত্ন করে কিউবিজম সিম্বলিজম ও সুররিয়ালিজম আয়ত্ত করে এলুম। শুধু কি পদ্ধতি? ও দেশে আমার জীবনযাত্রা ছিল বোহেমিয়ান। যেমন আর দশ জন আর্টিস্টের। সেটি কি এ দেশে হবার জো আছে! আর প্রবলেমের কথা যদি উঠল তা হলে বলি, ওসব প্রবলেম এ দেশেও দেখা দেবে, কারণ আধুনিকতা অপরিহার্য। ওসব পাশ্চাত্য নয়, বিশ্বজনীন।

আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম যে মেসোমশায়ের টাকা আমি তাঁকে কৌশলে ফেরৎ দেব। মালার বিয়ের সময়। ও টাকা আমার পাওনা নয়, তিনি আমার ছবি ঠিক চিনতে পারেননি। প্যারিসের প্রদর্শনীতে আমার ছবি দেখে সমজ্ঞদাররাও ধরতে পারেননি যে, ও ছবি একজন ভারতীয়ের আঁকা। মেসোমশায়ও ধরতে পারতেন না যদি প্যারিসে দেখতেন। উঃ! বুকটা ফেটে যায় শুনলে যে আমি ভারতীয় শিল্পী! আমি ভারতীয় হতেও রাজী আছি, শিল্পী হতেও রাজী আছি, কিন্তু ভারতীয় শিল্পী হতে নারাজ।

আমার ছবি ইউরোপীয়রাই কেনে বেশী। আরো বেশী দাম দিয়ে। ওদেরও ধারণা ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শন সংগ্রহ করছে। মরুক গে। টাকাটা আমার দরকার। আমি কেন

ছাড়ি? কিন্তু পরে একদিন ওদের দেশের সমজদাররাই বলবে যে আইকং একজন মডার্ন আর্টিস্ট, যাঁর দেশ নেই, কাল আছে।

আমার মনে হয় মেসোমশায় এটা জানতেন, সব জেনেশুনেই আমার ছবি কিনতেন, কারণ তাতে এমন কিছু ছিল যা তাঁকে স্পর্শ করত। আমি তো রং দিয়ে আঁকতুম না, আঁকতুম রক্ত দিয়ে। যে বেদনা অহরহ আমাকে বিহ্বল করে রেখেছিল তারই একটা ক্যাথারসিস অন্বেষণ করতুম চিত্রকলায়। ওদিকে মেসোমশায়েরও একটা ব্যথা ছিল। ছেড়ে চলে এসেছেন চিরাচরিত জীবন।

একদিন বললুম "জীবন তো নতুন করে আরম্ভ হলো। যেমনটি চেয়েছিলেন।"

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তার পরে ধীরে ধীরে বললেন, "পুরোনো পরিবেশটাকে কোনো রকমে ফিরিয়ে আনা গেল। এই পরিবেশেই আমি সুখী ছিলুম, তাই আবার আমার সুখী হওয়া তো উচিত। তবু হতে পারছি কই? পুরোনো বোতলে আমি চাই নতুন মদ। ভারতও চায় তাই। কিন্তু কোথায় সে নতুন মদ! তুমি বলবে, কেন? ইউরোপে। দূর। ইউরোপ যাকে নবযৌবন বলছে সেটা কায়কল্প।"

এ নিয়ে আমি তাঁকে আর খোঁচাইনি। তিনি যদি নতুন করে আরম্ভ করতে জানতেন তা হলে করে দেখাতেন। জানতেন না বলেই আকুলতা বোধ করতেন। আমার যদি জানা

থাকত আমি তাঁকে সবিনয়ে জানাতুম। আমার নিজের ধারণাও তখন অস্পষ্ট। এখনো খুব এমন কী স্পষ্ট।

বাইরে ত্রিশ বছর কাটিয়ে এসে মেসোমশায় মনে করেছিলেন দেশের লোক সেই স্বদেশী যুগেই রয়েছে। সেই তপোবন পুনরাবর্তনের যুগে। মোহভঙ্গ হতে বেশী দেরি হলো না। ধর্ম আর ধর্মের জন্যে নয়। ধর্ম এখন রাজনীতির জন্যে। দেউলিয়া রাজনীতিকদের সম্বল হলো ধর্ম। তাঁরা ভাজেন ঝিঙে তো বলেন পটল। তেমন ধর্ম দিয়ে রাজনীতিক অভিসন্ধি হাসিল হতে পারে, কিন্তু একটা মহৎ জাতির পুনর্জাগরণ সাধিত হবে না। তা হলে কী দিয়ে সাধিত হবে? বিজ্ঞান? বিজ্ঞানের উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান দিয়ে যেমন অশেষ মঙ্গল হতে পারে তেমনি অপরিসীম অমঙ্গলও হতে পারে। তার রাশ টানবার জন্যে যদি থাকে ধর্মবুদ্ধি তা হলেই তার দ্বারা বিশুদ্ধ মঙ্গল হবে। আর নয়তো অনিয়ন্ত্রিত হয়ে সে মানবকুল ধ্বংস করবে। ধর্মকে মানুষের বড় দরকার। এটা জরুরি।

ওদিকে মাসিমা তাঁর নতুন বাড়ী নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মেয়ের বিয়ের ভাবনায় একটু ঢিলে দিয়েছিলেন। কলকাতার বাজার দেখে একটু দমেও গেছলেন। তাঁর দিদিরা তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, বুড়ি, মেয়েটাকে অমন করে বসিয়ে রাখিসনে। দিনকাল বদলে গেছে। সেকালে যেমন পাশ করা মেয়ে শুনলে ভয় পেয়ে যেত একালে তেমন পায় না। শাশুড়ীরাই চায় পাশ

করা বৌ। ছুটো একটা পাশ হলো হাতের পাঁচ। কে জানে কখন কাজে লেগে যায়।”

মালাকে কিছু আদা আর কিছু নুন কিনে দেওয়া হয়েছে। সে আদানুন খেয়ে প্রাইভেট ম্যাট্রিকের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তার বাপ তার প্রধান সহায়। পেশাদার এক টিউটরও রাখা হয়েছে। নীলির মতো বান্ধবীরাও একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়। নীলির কাছে শুনি বনের পাখীকে খাঁচার বুলি কপচাতে শেখানো হচ্ছে। যে ছিল অকুতোভয় তাকে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার ভয় দেখানো হচ্ছে।

সাধে কি মেসোমশায়ের মুখখানা শ্রাবণের মেঘলা আকাশ! কী করা যায়! রূঢ় বাস্তব। সীতাকেও অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। মালাকেও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে হবে। দুনিয়া তাকে বাজিয়ে নেবে। অমনিতেই স্বীকার করবে না যে সে শিক্ষিতা মহিলা। কে জানে কোন্‌দিন কাজকর্মেরও প্রয়োজন হবে। তখন স্বীকার করবে না যে তার যোগ্যতা আছে। ঋষিকন্যারা একালে জন্মান্তর গ্রহণ করলে তাদেরকেও সার্টিফিকেট নিতে ও দেখাতে হতো।

মালা জানে সবই, কিন্তু গুছিয়ে লিখতে পারে না, লিখলেও পরীক্ষার মতো করে নয়। মাস্টার মশায় তার ভালোর জন্যেই তাকে দিয়ে ভুল ইংরেজী লেখান। সে বিদ্রোহ করে। তার বাপ অসহায়। পরীক্ষকরাই যে মাস্টারের মাস্টার।

“মালা ভুল ইংরেজী শিখছে বলে ওর বাপের যে মাথাব্যথা

তার সিকির সিকি যদি থাকত ওর ভালো বিয়ের জন্যে। তা হলে এত দিনে একটা হিল্লে হয়ে যেত, বড়দা।" মাসিমা বললেন একদিন তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর গুপীবাবুকে।

"ভায়া হে," গুপীবাবু বললেন মেসোমশায়কে, "আমাকে তুমি বুঝিয়ে দিতে পারো ভুল ইংরেজী শিখে আমার কী ক্ষতি হয়েছে আর ঠিক ইংরেজী শিখে তোমার কী লাভ হয়েছে। দিব্যি ওকালতী করে খাচ্ছি। তোমার চেয়ে ঢের বেশী রোজগার করেছি ও করছি। সত্তর আশি বছর বয়স পর্যন্ত করতে থাকব। কই, জজ সাহেবরা তো আমার ইংরেজীর ভুলের জন্যে আমাকে মোকদ্দমা হারিয়ে দেন না।"

মেসোমশায় নিরুত্তর। তাঁর ভায়রা ভাই ইংরেজীনবিশ সরকারী চাকুরে। মিস্টার চৌধুরী তাঁর হয়ে উত্তর দেন, "কিন্তু জজসাহেবরা কোনো কালে আপনাকে জজসাহেব করবেন না।" তারপর মেসোমশায়ের দিকে ফিরে বলেন, "অমল, তোমাকেও ছাড়ছিনে। তোমার মেয়েকে তুমি ক্লাউড-কুকু-ল্যাণ্ডে রাখতে চেয়েছিলে। এখন তাকে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসতে দেখে কষ্ট পাচ্ছ। কিন্তু এটাও তার শিক্ষার অঙ্গ। রোমে যখন যাবে তখন রোমানদের মতো আচরণ করবে। সেখানকার লোক ঠিক ইংরেজী বোঝে না। ঠিক জ্যোতির্বিজ্ঞান জেনেও চন্দ্রগ্রহণের দিন হাঁড়ি ফেলে। গঙ্গাস্নান করে। তোমার মেয়ে যদি বিদ্যা ফলাতে যায় শ্বশুরবাড়ী গিয়ে অশান্তি ভোগ করবে।"

মেসোমশায় চুপ করে শুনে গেলেন। একটি কথাও শোনালেন না। পরে মাসিমাকে বললেন, "এত বড় একটা দেশে একটি মেয়ে একটু অরিজিনাল হবে কেউ সেটা সহ্য করবে না। কেউ তার জন্যে ত্যাগস্বীকার করবে না। সে-ই করবে সকলের জন্যে ত্যাগস্বীকার। অন্যায় নয়? আমি স্থির করলুম আমার মেয়ে প্রাইভেট ম্যাট্রিক দেবে না, জুনিয়র কেম্‌ব্রিজ দেবে। তার পর সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ। একটু দেরি হবে এই যা আফসোস।"

মাসিমার চক্ষুস্থির। তিনি অবশ্য প্রাইভেট ম্যাট্রিকই বহাল রাখলেন। কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম। মেসোমশায় পীড়াপীড়ি করলেন না।

আমাকে একান্তে বললেন, "ত্রিশ বছর বাদে দেশে ফিরে দেখছি জাতকে জাত সুবিধাবাদী বনে গেছে। এ দেশের কপালে দুঃখ আছে, দেবপ্রিয়।"

ভুলে গেছলুম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল দশ বছর বাদে যেদিন সেয়ানে সেয়ানে লঙ্কা ভাগ করে নিল।

"মালাকে আমি কেমন করে বাঁচাব এর ছোঁয়াচ থেকে? এই সর্বনেশে সুবিধাবাদের ছোঁয়াচ থেকে? আমার আজকাল রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, দেবপ্রিয়।" আমাকে বিশ্বাস করে বললেন মেসোমশায়। সত্যি তাঁর চোখের কোল ফোলা ফোলা।

আমি এর উত্তরে কী বলতে পারি? অন্য প্রসঙ্গ পাড়ি।

ওদিকে মাসিমারও রাত্রে ভালো ঘুম হয় না। একদিন স্পষ্ট বললেন আমাকে। "অবাধ বিকাশের ফল কী হয়েছে, দেখছ তো। মালাকে মনে হয় নীলিমার চেয়ে বড়। লোকে যখন শোনে ওর বয়স মোটে সতেরো তখন মুচকি হাসে। ভাবে দু'তিন বছর হাতে রেখে বলছি। মেয়ে যার দিন দিন শশিকলার মতো বাড়ছে—পূর্ণিমার পরেও থামতে চায় না—তার তো রোজ রাত্রে কোজাগরী।"

নীলির বয়স তখন উনিশ। তখনো বিয়ের ফুল ফোটেনি। আমার মা অত লেখাপড়া জানতেন না। তবু একটু আধটু ইংরেজীর ফোড়ন দিয়ে বলতেন, "আমার মাথার উপর আন্দ্রোক্লিসের খড়্গ ঝুলছে।"

বাবার কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাত ছিল না। তিনি তাঁর দ্বিতীয় সংসার নিয়ে স্বতন্ত্র বাস করতেন। ছেলেবেলায় তাঁর উপর রাগ করে আমি বাড়ী থেকে পালাই। ফিরতে ইচ্ছা ছিল না। ফিরি তো কৃতী হয়ে ফিরব। স্বাবলম্বী হয়ে ফিরব। ছবি আঁকার হাত ছিল। লক্ষ্ণৌতে গিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্তি হই। ওখানকার এক বাঙালী ডাক্তার পরিবার আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরে আমি তাঁদের সম্ভ্রান্ত পেশেন্টদের প্রতিকৃতি এঁকে আত্মনির্ভর হই। তাঁদের একজন পরে উজীর হন। সরকারী সাহায্য দিয়ে আমাকে লণ্ডনে পাঠান। সাহায্য মাত্র দু'বছরের জন্যে। দু'বছরে কতটুকুই বা শেখা যায়! কপাল ঠুকে হাজির হলুম আর্টিস্টদের মক্কায়।

আমার উত্তম দক্ষিণ' হস্ত আমাকে অভাবে পড়তে দেয়নি। কিন্তু খাটতে হয়েছে শ্রমিকের মতো।

. বাস্তবিক, শিল্পীতে শ্রমিকে ভেদ নেই। কস্মিন্‌কালে ছিল না। বুর্জোয়া মূল্যবোধ এসে ভেদবুদ্ধি জাগিয়েছে। বুর্জোয়াদের কমিশন না হলে ছবি আঁকাই হয় না, তাই আমরা বুর্জোয়াদের দ্বারস্থ হই। যেমন রাজমিস্ত্রী যায় প্রাসাদ গড়তে। তা বলে নিজে বুর্জোয়া হতে চাইনে। সে পথে মরণ। বুর্জোয়াত্ব পাবার পর শিল্পী আর শ্রমিক থাকে না। এ যুগে সেই হয়েছে বিপদ। সমাজে যেই তার উত্থান হয় রূপলোকে অমনি তার পতন। ডানা কাটা এন্‌জেল যেমন। ডানা কাটা গেলে এন্‌জেলের আর কী থাকে? আমি উড়তে চাই মর্ত্য থেকে স্বর্গে, স্বর্গ থেকে মর্ত্যে। ডানা আছে আমার। আমার মতো ধনী কে?

নীলিকে আমি বলি, "অভাবে স্বভাব নষ্ট। অভাবে পড়া ভালো নয়। আবার পায়ের উপর পা দিয়ে আরামে থাকলেও স্বভাব নষ্ট। পরগাছা হওয়াও ভালো নয়। তোকে বোধ হয় ডানা কাটা পরী বলে কারো ভ্রম হবে না। তবু তুই তোর ডানা দুটো কাটতে যাস্‌নে। বরের জন্যেও না। ঘরের জন্যেও না। উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে। সে অন্নের স্বাদই আলাদা।"

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর মালাকে নিয়ে তার মা পাহাড়ে ঘুরে এলেন। তার বাবা গাছপালা ছেড়ে কোথাও নড়বেন না।

গরমেই তিনি ভালো থাকেন। তাঁর যে ব্যথা সে তো পাহাড়ে গেলে সারবে না। আমি মাঝে মাঝে যাই। একটু গল্প করি। তাতে আমার নিজের হাওয়া বদলের কাজ হয়।

"বৈজ্ঞানিককে মারে কে? এটা তারই তো যুগ।" মেসোমশায় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন। "তবে তোমাদের কথা আলাদা। এ যুগে তোমাদের বেঁচে থাকা শক্ত। কায়িক অর্থে বাঁচলে যদি তো আত্মিক অর্থে নির্বাণ লাভ করলে। তোমরা আবার বাঁচাবে কাকে? বাঁচলে তো বাঁচাবে।"

আমি কি এ কথা মাথা পেতে মেনে নিতে পারি? আর্টের প্রেস্টিজে বাধে। ধর্ম অর্থ কাম এরাই হলো চিরকালের যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুন। তার পরে কে বড়? আর্ট না বিজ্ঞান? নকুল 'না সহদেব? যমজ হলেও নকুলই বড়। আর্ট আগে হয়েছে। তার পরে বিজ্ঞান। যে কোনো সভ্যতার ইতিহাসে এই বলে। বিংশশতাব্দীর সভ্যতা কি সৃষ্টিছাড়া?

"এ যুগটা তো, মেসোমশায়, আপনার চোখের সুমুখেই সরে যাচ্ছে। এই যে আবার মহাযুদ্ধ বাধবে শুনছি এ যদি বাধে তবে যুগান্তর অনিবার্য। তখন দেখবেন শ্রমিকদের যুগ এসেছে। শিল্পীরাও শ্রমিক তো। কাজেই সেটা হবে শিল্পীদেরও যুগ। আমরা তখন সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ব। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বাড়ী উঠবে শ্রমিকদের জন্যে, সাধারণের জন্যে। আমরা গিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুরাল চিত্র আঁকব। ওরাই আমাদের চাঁদা করে খাওয়াবে পরাবে, আস্থানা

জোটাবে। আমাদের জন্যে সব কিছু ফ্রী। তাই আমাদের দিক থেকেও সব কিছু ফ্রী। ছবি এঁকে আমরা এক পয়সাও নেব না। অশন বসন আবাসের জন্যে এক পয়সাও দেব না। বেচাকেনার নাগপাশ থেকে আমরা বাঁচতে চাই। ওরা যদি আমাদের বাঁচায় আমরাও ওদের বাঁচাব। বাঁচবে ওরা সৌন্দর্যের অমৃত পান করে। এমন জাদু করব যে যেদিকেই তাকাবে সেদিকেই সৌন্দর্য। চোখ চাইলেই সৌন্দর্য।"

মেসোমশায় সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, "এটা একটা দেখবার মতো স্বপ্ন। শিল্পী বল, বৈজ্ঞানিক বল, দার্শনিক বল, আসলে ওরা এসেছে একটা বাণী নিয়ে। সেটা দিয়ে না যাওয়া অবধি ওদের মুক্তি নেই। বাণীকে পণ্য করে বেচাকেনার ব্যাপারে নামলে বাণী তার পোটেন্সী হারায়। এই সওদাগরি যুগ থেকে পরিত্রাণ না পেলে আমরা আর্টিস্টরা ও ইনটেলেকচুয়ালরা ধীরে ধীরে নির্বীর্য হব। অথচ ঋষিদের ভারতে বা সোক্রেটিসের গ্রীসে ফিরে যাবার পথ গেছে হারিয়ে। পথ করে নিতে হবে আমাদের, কিন্তু কেমন করে তা আমি জানিনে।"

আমি তখনকার দিনে সবজান্তা। বললুম, "আমি জানি। রেলে যারা কাজ করে তারা যেমন ফ্রী পাশ পায় তেমনি শিল্প বিজ্ঞান দর্শন নিয়ে যারা আছে তাদেরও ফ্রী পাশ দেওয়া হবে। শুধু রেলভ্রমণের জন্যে নয়, সব কিছুর জন্যে। বাড়ী চাই। পাশ দেখালুম। অমনি বাড়ী মিলে গেল। ভাড়া গুণতে হবে না। গাড়ী চাই। পাশ দেখালুম। অমনি

গাড়ী মিলে গেল। ভাড়া লাগবে না। খাবার চাই। পাশ দেখালুম। অমনি খাবার মিলে গেল। দাম দিতে হবে না। পোশাক চাই। পাশ দেখালুম। অমনি পোশাক জুটে গেল। বিল মেটাতে হবে না। বাকীটা আপনি কল্পনা করে নিন।"

"কিন্তু ঐ পাশখানার পরিবর্তে তুমি কী দিচ্ছ?" জেরা করলেন তিনি।

"রাশি রাশি ছবি। ঐ নিয়েই তো আছি দিনরাত।"

মেসোমশায় বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু ওটা অত সহজ নয়। আমাদের সমাজে ও-পরীক্ষা তিন হাজার বছর ধরে হয়েছে। পৈতে দেখালে পাড়াগাঁয়ে কিছুদিন আগেও সব কিছু অমনি পাওয়া যেত। যার পৈতে নেই তার ভেক। ভেক নিয়ে ভিক্ষায় বেরোলে এখনো সব কিছু অমনি পাওয়া যায়। এর মূলে ছিল ওই আইডিয়া যে, যারা ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরধ্যান নিয়ে আছে তাদের ফ্রী পাশ দিতে হবে। দিয়ে দেখা গেল ব্রাহ্মণ হলে যেমন পৈতে নেয় তেমনি পৈতে নিলেই ব্রাহ্মণ হয়। বৈষ্ণব হলে যেমন ভেক নেয় তেমনি ভেক নিলেই বৈষ্ণব হয়। তখন আর তাকে ব্রহ্মজ্ঞানী হতে হয় না, ভগবদ্‌ভক্ত হতে হয় না। ধর্ম বলতে সেই খাড়া বড়ি থোড়। বিদ্যা বলতে সেই থোড় বড়ি খাড়া। শিশুর হাতে মোয়া ধরিয়ে দিয়ে চালাকরা সোনাটা দানাটা নেবে। তেমনি তোমার পাশ সিস্‌টেমও হয়ে দাঁড়াবে পৈতে সিস্‌টেম বা

ভেক সিস্টেম। দিনরাত লোক ভোলানো মোয়া তৈরি চলবে। তারই নাম দেওয়া হবে দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প। পাশ যার আছে সেই বৈজ্ঞানিক বা শিল্পী। বাণী নাই বা থাকল।"

"তা হলেও," আমি তর্ক করলুম, "আপনি স্বীকার করবেন যে সভ্যতা আজকের এই চোরাগলির ভিতর দিয়ে আর বেশী দূর যেতে পারবে না, তার দম বন্ধ হয়ে আসবে। মোড় তাকে নিতেই হবে। পাশ যাকে বলছি সেটা একটা সিম্বল। আপনি তার বদলে আর কোনো সিম্বল ব্যবহার করতে পারেন। এমন এক দিন আসবে যে-দিন আমার মুখ দেখেই সকলে সব কিছু দেবে। মুখ দেখেই চিনতে পারবে যে, আমি একজন দাতা।"

মেসোমশায় চিন্তান্বিত হয়ে বললেন, "কিন্তু মুশকিল বাধবে কোথায় তা জানো? তুমি যা দিলে আর তুমি যা নিলে এ দুইয়ের মধ্যে সমতা থাকা এসেন্সিয়াল। তুমি বলবে সমতা আছে। সমাজ বলবে সমতা নেই। মতবিরোধ অনিবার্য। যাঁরা আর্টের কদর জানেন তাঁরা তোমার পক্ষে। যাঁরা বাড়ীভাড়া গাড়ীভাড়া খোরাক পোশাক ইত্যাদির কদর জানেন তাঁরা তোমার বিপক্ষে। এমন বিচারক কোথায় যিনি স্পিরিচুয়াল ও মেটিরিয়াল উভয়বিধ সামগ্রীর কদর ও তৌল জানেন? এ রকম তো প্রায়ই দেখা যায় যে, শিল্পীর মৃত্যুর এক্ শ' দু' শ' বছর পরে তার এক একখানা ছবি পাঁচ লাখ

দশ লাখ টাকায় বিকোয়। অথচ তার দীর্ঘ জীবনে হয়তো সে সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকাও উপার্জন করেনি। সম-সাময়িকদের বিচারে স্পিরিচুয়ালের অনুপাতে মেটিরিয়ালের দাম বেশী। সময়ের ব্যবধান ভিন্ন আর কোনো উপায় নেই যাতে তোমার সৃষ্টির কদর চাষী মিস্ত্রী দর্জি ইত্যাদির উৎপন্ন সামগ্রীর মোট দরের সঙ্গে সমতাসম্পন্ন বলে প্রমাণিত হবে। তুমি মনেও কোরো না যে, একটা যুদ্ধ বা একটা বিপ্লবের ফলে সময়ের ব্যবধান সংক্ষিপ্ত হবে।"

আমি তো প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলুম, মেসোমশায় তা অনুমান করে বললেন, "সভ্যতার মোড় ফিরবে কখন, জানো? যখন সমাজ স্বীকার করবে যে মেটিরিয়ালের অনুপাতে স্পিরিচুয়ালের দাম বেশী। বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ রস, বিশুদ্ধ রূপ ইত্যাদির সঙ্গে সমতা রাখতে পারে এমন ঐশ্বর্য কুবেরের ভাণ্ডারেও নেই। এসব ব্রতে যারা নিযুক্ত তারা যদি ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে তা হলে তারা যা দিয়ে যায় তা মানবাত্মার পরম সম্পদ। সমাজের কাছে এমন একটা স্বীকৃতি আজকের দিনে কোনো দেশেই লক্ষিত হচ্ছে না। বিপ্লবী দেশ বলে যাদের পরিচয় সেসব দেশেও না। ফ্রান্সেও না, রাশিয়াতেও না। এর জন্যে দোষ কিন্তু শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদেরও কম নয়। তাঁরা মনে করেন নিছক নূতনত্বই অগ্রসরতা, গতি মাত্রেই অগ্রগতি। তা নয়। যা ধোপে টিকবে না তাকে বাদ দিলে পরে যা বাকী থাকবে তাই প্রগতি। তোমাকে এমন

ছবি আঁকতে হবে যা বাকী থাকবে। তার জন্যে তুমি লাখ টাকা যদি পাও তা হলেও সেটা ফ্রী। সেটা তুমি অমনি দিয়ে গেলে।"

জানি, লাখ টাকা আমাকে কেউ দেবে না! তবু ভাবতে দোষ কী যে, যা দিল তা রং তুলি ক্যানভাস ইত্যাদির কেনা দাম ও তার সঙ্গে দেবপ্রিয় আইকৎ বলে এক শ্রমিকের পারিশ্রমিক। কিন্তু আসল ছবিখানা অমনি পেয়ে গেল। ওটা আমার দান। ওটা ফ্রী। আমি সেই গর্বে ছবি আঁকি আর ছবির দাম ধরি আর দাম নিয়ে ফ্রী দিই। ওটা দেবপ্রিয় বলে এক প্রেমিকের প্রেমের মূল্যে অমূল্য। শ্রমিক দাম নেয়। প্রেমিক নেয় না।

তার পর কী হলো শোন। মালা ম্যাট্রিক পাশ করল ঠিক। পাহাড় থেকে ওর মা ওকে নিয়ে ফিরলেন। রূপ যা খুলেছে মেয়ের! ইচ্ছা করে এঁকে অমর করে দিতে। আমি আর্টিস্ট, আমি এই সব ভাবছি। আর ওদিকে ওর মা ভাবছেন ওর রূপ অম্লান থাকতেই ওর বিয়ে দিয়ে দিলে ভালো বর ভালো ঘর পাবেন। এখন থেকে ঠিকঠাক করে রাখলে পরের বছর শুভবিবাহ। নারীর যৌবন কতদিন থাকে! সেকালে বলত কুড়িতেই বুড়ি। একালে তা বলে না। কিন্তু কুড়ি পেরিয়ে গেলে ফিরেও তাকায় না। অতএব মালাকে অবিলম্বে কোনো এক সুপাত্রের গলায় ঝুলিয়ে দাও। কলেজ? কলেজে পড়তে চায় বিয়ের পরে পড়বে। আপাতত? আপাতত কলেজে

নামটা লেখাক। পড়াটা নামে মাত্র। তবে সেটারও একটা বাজারদর আছে। বিয়ের বাজারে।

নীলির মুখে এসব কথা শুনি আর সে বেচারিকে সান্ত্বনা দিই ও মনের জোর জোগাই। মালার চেয়ে সে বয়সে বড়। তারই তো আগে বিয়ে হওয়া উচিত। কিন্তু বিয়েতে বর লাগে। বর আমি কেমন করে জোটাব? বাবা চেষ্টা করলে পারতেন। কিন্তু তিনি চেষ্টা করলেও নীলি তাঁর অনুগ্রহ নেবে না। তা ছাড়া বাংলাদেশের শামলা মেয়ে বলে সে এমনিতেই অভিমানী। নীলির বিয়ের ভাবনা মা ভাবছেন। আপাতত সে আমার কাছে ছবি আঁকা শিখছে। তার ডিজাইনের হাত ভালো। তাকে বলেছি তার বিয়ে না হওয়া অবধি আমারও বিয়ে হবে না। কিন্তু এর থেকে সে যেন ভুল না বোঝে আমি শুধু বোনের বিয়ের জন্যে দায়ে পড়ে দারপরিগ্রহ করব। মা সে-রকম কিছু বলতে উদ্যত হলে আমি বাড়ী ছেড়ে পালাবার ইশারা দিয়ে ঠেকাই। মাকে আর নীলিকে মাসীর বাড়ী থেকে উদ্ধার করে ভবানীপুরে বাসা বেঁধেছি। তা বলে আবার উড়ব না এমন কোনো কথা নেই। দেশে যদি তেল নুন লকড়ি না জোটে দ্বিতীয়বার আমাকে বিদেশে যেতে হবে। ওটা হয়তো পেট্রিয়টিজম নয়। কিন্তু দেশকে ভালোবাসি বলে ভিক্ষুকের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে আমার বাধে।

এমন যে আমি সেই আমার উপর মাসিমার আদেশ

হলো, "দেবপ্রিয়, মালার জন্যে একটু বলে দেখবে তোমার বন্ধুবান্ধবদের ? হয়তো লেগে যাবে।"

আমার বলা উচিত ছিল মাসিমাকে, আমাকে মাফ করবেন, মাসিমা। আমার এতে বিশ্বাস নেই। একজনের সাথী কে হবে আরেক জন তা ঠিক করে দিতে পারে না। মালা বড় হলে মালার উপরেই ছেড়ে দিতে হবে এ ভার।

মাসিমাকে না বলে বললুম কিনা নীলিমাকে। নীলি তো হেসে অস্থির। শেষে বলল, "ভদ্রমহিলা কি তোমাকে অত কথায় বলতে পারেন যে তাঁর মেয়েটিকে তুমিই বিয়ে কর ? বলেছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।"

আমি তা শুনে রেগে অস্থির। নীলির মাথাখানা জিলিপির প্যাঁচ। চাঁটি মেরে বললুম, "যা। যা। বাজে বকিস্‌নি। অসম্ভব।"

"অসম্ভব বলে একটা শব্দ—নেপোলিয়ন বলতেন—বোকাদের অভিধানেই মেলে। আমার দাদা তো বোকা নয়।" এই বলে সে গম্ভীর স্বরে বলল, "তবে একটা বাধা আছে। মালার ধনুকভাঙা পণ সে রাজপুত্তুর ভিন্ন আর কারো গলায় মালা দেবে না।"

"তাই নাকি ?"

"তাই তো ও বলে। ওর বিশ্বাস এটা রূপকথার জগৎ। এর কোথাও একজন রাজপুত্র আছে। সে যথাকালে আসবে ও কী যেন একটা বীরত্বের কাজ করবে। তখন মালা তাকে মালা দিয়ে বরণ করবে।"

আমি অবাক হলুম। রুদ্ধশ্বাসে বললুম, "তারপর?"

"তারপর আর কী! তুমি তো রাজপুত্র নও। মন্ত্রীপুত্রও নও। নিদেন পক্ষে সওদাগরপুত্রও নও।" নীলিমা আবার লঘুভাবে বলল, "তবে সওদাগরি আফিসের বড়বাবুর ত্যাজ্য পুত্র বটে।"

আমি সংশোধন করে বললুম, "ত্যজ্য নয়, ত্যাগী। তিনি আমাকে ত্যাগ করেননি, আমিই ত্যাগ করেছি তাঁকে।" রুদ্ধ শ্বাস দীর্ঘ শ্বাসে পরিণত হলো।

তা হলে মালার বিশ্বাস এটা রূপকথার জগৎ। অদ্ভুত মেয়ে। ওর কপালে আছে মোহভঙ্গ। মোহভঙ্গ থেকে ওকে বাঁচাবে কে?

যা হোক, মাসিমাকে আমি ওসব কথা বললুম না। মালার জন্যে রাজপুত্রের অন্বেষণ করলুম। আমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ছিলেন তুবরাজপুরের যুবরাজ কুসুমাকর সিংহ রায়। তুবরাজপুর যে কোথায় তাই আমার জানা ছিল না। কুসুমাকর কলকাতায় এলে কোন্‌খানে ওঠেন তা আমি জানতুম। তুবরাজপুর হাউস বলে তিনতলা একটি বাড়ীতে। আলীপুরে। তিনি যেবার লণ্ডনে যান আমি তাঁর গাইড হয়েছিলুম। পরে তিনি আমার ছবি কিনেছেন। বয়স আমার চেয়ে কম। চেহারা আমার মতো কালো নয়। অবিবাহিত।

কুসুমাকরকে একদিন ধরে আনা গেল বুধবার সন্ধ্যায় বালীগঞ্জ অঞ্চলে। ঘূণাক্ষরেও তাঁকে জানাইনি যে মালার জন্যে

আমরা পাত্র খুঁজছি। জানলে পরে তিনি সেদিন কলকাতা ছেড়ে উধাও হতেন। অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির ছেলে। গ্রাম্য পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। কলকাতার নাগরিকদের তিনি বিষম ভয় করেন। পাছে কেউ তাঁকে পাড়াগেঁয়ে বলে হাসাহাসি করে। কেউ হাসছে দেখলেই তিনি গায়ে পেতে নেন। এমন মুখ করেন যেন কেউ তাঁর বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। লণ্ডনে তাঁকে আমি হাতে নিয়েছিলুম। সে কী ঝকমারি! ও দেশের মেয়েরা কারণে অকারণে খিল খিল করে হাসে। কুসুমাকর মনে করেন বিদেশিনীদের চোখে তিনি একটি গরিলা কি ওরাং ওটাং। স্বদেশিনীদের সম্বন্ধেও তাঁর একই রকম ধারণা।

মাসিমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বলি, "এঁরা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট জমিদার। সেই বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া। লণ্ডনে পড়েছেন।"

কুসুমাকর যথেষ্ট ভদ্রতার সঙ্গে আমার প্রতিবাদ করে বলেন, "উত্তরবঙ্গের নয়। পশ্চিমবঙ্গের। বিশিষ্ট নয়। সামান্য। জমিদার নয়। পত্তনিদার ও কয়লার খনির মালিক। বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া নয়, ইংরেজ আমলের খেতাবধারী। লণ্ডনে পড়াশুনা করিনি। ডিনার খেয়ে টার্ম রেখেছি। পরীক্ষার ভয়ে পালিয়ে এসেছি।"

কী বিনয়! আমি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললুম, "হীয়ার। হীয়ার।"

মালার মাসতুতো ও মামাতো বোনেরা ফিস ফিস করে কী যেন বলছিল। আমার মনে হলো ওরা বলছে, বারো ভূতের এক ভূত।

কুসুমাকরকে একবার শিকারের কাহিনী ধরিয়ে দিতে পারলে তিনি নির্ভীক। তখন সাহসই বা আছে কার যে হাসবে? বাঘ যে কত রকম চাতুরী করতে পারে, মানুষকে যে কত বড় বিপদে ফেলতে পারে, প্রাণ দেবার আগে প্রাণ নেবার জন্যে কত কাছে যে আসতে পারে সেসব কুসুমাকর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেন আর সাসপেন্স সৃষ্টি করেন। গায়ে কাঁটা দেয়।

"তার পর?" মালা প্রশ্ন করে ছোট মেয়েটির মতো গালে হাত দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে শুনতে শুনতে। যেমন শুনত ডেসডেমোনা ওথেলোর বীরত্ব অবদান।

"তার পর সেবারেও আমি বেঁচে যাই নেহাৎ পরমায়ু ফুরোয়নি বলে।" কুসুমাকর উত্তর দেন দু'হাত যোড় করে।

এই তো কেমন রাজপুত্র! এই তো কেমন বীরত্বের কাজ! মালা আর কী চায়? এক কাঁড়ি টাকা আছে, কলকাতায় বাড়ী আছে, শিক্ষাও মন্দ নয়, স্বভাবটিও ভালো। পরের বার অর্গ্যান বাজিয়ে ও অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে কুসুমাকার প্রমাণ করে দিলেন যে সংস্কৃতিও যথেষ্ট। ওঁর বিরুদ্ধে একটিমাত্র পয়েন্ট আমি দেখি। ওঁর বয়সটা মালার চেয়ে দশ এগারো বছর বেশী। পরে শুনেছিলুম ওঁর নাকি একবার বিয়ে হয়েছিল

সতেরো আঠারো বছর বয়সে। সে বৌ বারো বছর বয়সে মারা যায়।

আমি কুসুমাকরকে বাজিয়ে দেখলুম। মালা যে কলকাতার মেয়েদের মতো নয় এটা তিনি লক্ষ করেছিলেন। আমার কাছে যখন শুনলেন যে, সে বর্মায় মানুষ হয়েছে শকুন্তলার মতো তপোবনে, তখন বিশেষ আকৃষ্ট হলেন। বললেন, "বাড়ীর লোকের অমত না থাকলে আমারও কোনো আপত্তি নেই, দাদা।"

বাড়ীর লোককে একবার দেখাতে হবে। মাসিমা তা শুনে বললেন, "তা হলে বুধবার নয়। অন্য একদিন আমরা আলাদা একটা পার্টি দেব। বিকেলবেলা গার্ডন পার্টি। ওই বুধবারের দলটিকে আমি এড়াতে চাই।"

এসব ব্যাপারে মেসোমশায়ের পরামর্শ চাওয়াও হয় না, নেওয়াও হয় না। তিনি নির্লিপ্ত পুরুষ। তাঁর পড়ার ঘরে বসে অধ্যয়নরত। কিংবা তাঁর প্রাইভেট ল্যাবরেটরিতে গবেষণারত। আর নয়তো তাঁর তপোবনে ধ্যানরত। গার্ডন পার্টির দিন তাঁকে টেনে বার করা হলো ল্যাবরেটারি থেকে। তিনি একটি তরুবেদীতে আশ্রয় নিলেন। তাঁকে দেখলে মায়া হয়। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দুটো একটা কথা কয়ে আসি।

কুসুমাকরের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর কাকা রত্নাকর, তাঁর দুই ভাই করুণাকর ও কমলাকর। আর তাঁর বোন লবঙ্গলতা ও ভগ্নীপতি মথুরামোহন। এই সব সম্মানিত অতিথিদের

অভ্যর্থনা করতে যখন মেসোমশায়কে নিয়ে আসা হলো তিনি এঁদের সাজসজ্জা দেখে হকচকিয়ে গিয়ে উর্দুতে বাতচিং শুরু করলেন।

যাক, সেদিন বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা কুসুমারকে মালার সঙ্গে নিরিবিলি বেড়ানোর সুযোগ ঘটিয়ে দিই। মালা দেখাচ্ছে আর কুসুমাকর দেখছে তপোবনের ওষধি বনস্পতি। আর আমরা দূর থেকে তাদের উপর নজর রেখেছি। ভোজনপর্ব চলেছে। মেসোমশায় লুকিয়ে সরে পড়েছেন তাঁর গবেষণামন্দিরে।

একটা নারকেল গাছ দেখিয়ে দিয়ে মালা বলল কুসুমাকরকে, "ডাব খেতে ইচ্ছা করছে। পারবেন পেড়ে দিতে?"

"পারব না? আকাশের চাঁদ পেড়ে আনতে পারি, যদি আজ্ঞা পাই।" কুসুমাকর বললেন বীরের মতো সপ্রতিভ ভাবে।

মালা বলল, "সে আরেক দিন হবে। আজ ওই ডাবটাই পেড়ে দিন না।"

কুসুমাকর বললেন, "অত বড় মই পাই কোথায়?"

"ও তো আমাদের মালীও পারে।" মালা বলল ঈষৎ হেসে।

হাসিকে কুসুমাকর ফাঁসীর মতো ডরান। দেখা গেল তিনি ওইখান থেকে পিছু হটছেন আর সকাতরে বলছেন, "নারকেল গাছে উঠতে হলে কোমরে দড়ি বাঁধতে হয়। দড়িও তো এখানে মিলবে না।"

"ও তো আমাদের মালীও পারে।" বলতে বলতে হেসে ফেলল মালা। কুসুমাকরকে এবার জোরে জোরে পা চালাতে দেখা গেল। মালা রইল পিছনে পড়ে। এমনি করে একটি ফলের জন্যে একটা রাজপুত্তুর হাতছাড়া হলো।

তিন

এই দুর্ঘটনার পর থেকে আর আমি ঘটকালি করিনি। মাসিমাও করতে বলেননি। আশ্চর্যের কথা মাসিমাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর আন্তরিক অভিপ্রায় নয় যে, ও-রকম একটা পরিবারে মালার বিয়ে হয়। তিনি চান ক্যালকেশিয়ান। রাজপুত্তুর না হলেও ক্ষতি নেই।

নীলি বলল, "কেমন? যা বলেছিলুম তা ঠিক কি না? রূপকথার রাজপুত্তুর না হলে ও মেয়ে মালা দেবে না।"

"সে কী রে! কুসুমাকর কি রাজপুত্র নয়?" আমি বিস্মিত হই।

"উঁহুঁ! রূপকথার রাজপুত্র নয়। তুমি ভুল বুঝেছিলে।" নীলি বলল রূপকথার উপর ঝোঁক দিয়ে। শুধু রাজপুত্র হলে হবে না। রূপকথার রাজপুত্র হওয়া চাই।

আমি হার মানলুম। রূপকথার রাজপুত্রের সন্ধান আমি জানিনে। একদিন মেসোমশায়কে কথায় কথায় বললুম, "জগতে কী মিলতে পারে আর কী মিলতে পারে না প্রত্যেক ছেলেমেয়ের এটা জানা উচিত। বিজ্ঞান তো ভোজবাজি নয় যে চাইলেই রূপকথার রাজপুত্র এনে দেবে।"

তিনি এর জন্যে তৈরি ছিলেন না। চমকে উঠলেন। ভেবে বললেন, "না। বিজ্ঞান অমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় না।

কিন্তু প্রত্যেক ছেলেমেয়ের এটা মনে রাখা উচিত যে, কখনো ভুল করে চাইতে নেই। কারণ চাওয়া অনেক সময় ফলে যায়। যে যা চায় সে তা পায়। ভুল করে চাইলে ভুল করে পায়। ভক্তরা সেইজন্যে স্বর্গও চান না। তাঁরা চান ভগবানকে। স্বর্গ নিয়ে তাঁরা করবেন কী, যদি ভগবানের দেখা না পান? চাইলে স্বর্গও পাওয়া যায়। কিন্তু উন্নত আত্মার পক্ষে সেটা ভুল করে চাওয়া।"

"কিন্তু কোনো মেয়ে যদি রূপকথার রাজপুত্রকে চায়?" আমি ধাঁধায় পড়লুম।

"তা হলে সে রূপকথার রাজপুত্রকে পাবে। ঐ যে পাওয়া ওটা ভুল করে নয়। কারণ এই যে চাওয়া এটা ঠিক করে চাওয়া।"

আমার ধাঁধাঁ ঘুচল না। বললুম, "মেসোমশায়, তা কী করে হতে পারে? রূপকথার রাজপুত্র থাকলে তো পাবে? রূপকথার জগৎটাই যে অলীক।"

"আমি অতটা নিশ্চিত নই। রূপকথার জগৎ যদি অলীক হয় তবে রূপের জগৎটা কি কম অলীক?" মেসোমশায় পালটা প্রশ্ন করলেন। "চাঁদের মুখখানা কি চাঁদমুখখানি? এক এক করে সব ক'টা প্রতিমারই খড় বেরিয়ে পড়বে, যদি দূরবীন অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে যাও। কিংবা যদি ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে মনঃসমীক্ষণ কর। তা বলে কি মানুষ এতদিন অসুন্দরকে সুন্দর বলে ভ্রম করেছিল? বিজ্ঞান তার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে?"

আমি ভাবতে বসি। মেসোমশায় আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেন। "না। তাও নয়। রূপের জগৎও সত্য। চাঁদের মুখে বসন্তের দাগ থাকলেও সে সুন্দর। বিজ্ঞান তার সৌন্দর্যকে অপ্রমাণ করতে পারবে না। চায়ও না। বিজ্ঞানের দৃষ্টি সৌন্দর্যদৃষ্টি নয়। সৌন্দর্যদৃষ্টির যাথার্থ্য বিজ্ঞান অস্বীকার করে না। তেমনি ঋষিদের দিব্যদৃষ্টিও যথার্থ। সে দৃষ্টিতে জগৎ অমৃতময়। আনন্দের জগৎও সত্য। তেমনি আর একটি দৃষ্টি আছে। সে দৃষ্টি শিশুবয়সে তোমারও ছিল। এখন হয়তো নেই। সে দৃষ্টিতে জগৎ রহস্যময়। রূপকথার জগৎও সত্য।"

হাঁ! এ দৃষ্টি আমারও ছিল। কবে এক সময় হারিয়ে গেছে। তাই আমি এখন বাস্তববাদী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুররিয়ালিস্ট। জীবনে নয়, শিল্পে।

মেসোমশায় বলতে লাগলেন, "বরং এই রূপকথার জগৎই সত্যের সব চেয়ে কাছাকাছি। আর সব চেয়ে দূরে হলো আমাদের প্রাত্যহিক সংসারযাত্রার জগৎ, দিন আনা দিন খাওয়ার জগৎ, শাদা চোখে দেখা ব্যবহারিক জগৎ। কেবল কি সত্যের থেকে দূরে? সৌন্দর্যের থেকেও। রূপকথার জগতের যে রূপ ফুটেছে সে শুধু অতীতের আভ্যন্তরিক সত্য নয়, সব কালের। একালেরও। দেখবার চোখ আছে যার সেই দেখতে পায়। মালার সে চোখ আছে। আমার আশঙ্কা হয় সেও দিনে দিনে হারাবে। তখন সে আর রূপকথার রাজপুত্রকে পাবে না। চাইবেই না।"

তাঁর কণ্ঠে গভীর উদ্বেগ। সে উদ্বেগ কন্যার উত্তম বিবাহের জন্যে নয়। সাংসারিক সাফল্যের জন্যেও নয়। সেটা মাসিমার ভাগে পড়েছে। মেসোমশায় ভাবছেন মালা যেন তার শিশু-সুলভ বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। যেন চাইতে পারে। যেন ঠিকমতো চায়।

বললেন, "তখন সে আর সত্যের অন্দর মহলে প্রবেশ পাবে না। আমাদের মতো দেউড়িতে কিংবা সদর দালানে ঘুরে বেড়াবে।"

এবার তাঁর আক্ষেপ নিজের জন্যেও। কে জানে হয়তো আমার জন্যেও।

জগতের যে চেহারা আমি দেখি তা অশেষ বৈচিত্র্যময়। তা সত্ত্বেও তাতে আমার মন ভরে না। মনে হয় আমি সদর দালান ঘুরে ঘুরে দেখছি। অন্দরে আমার প্রবেশ নেই। অন্দরে যেতে হলে মালার মতো চোখ নিয়ে যেতে হয়। যে চোখ দিয়ে দেখা যায় রূপকথার সত্য। এক কালে আমারও সেখানে যাওয়াআসা ছিল। কিন্তু এখন আমি বড় হয়েছি কিনা। এখন আর ছোট হতে পারিনে। আমি হারিয়ে ফেলেছি আমার চাবী, আমার সাঙ্কেতিক শব্দ। মায়া কপাট বন্ধ হয়ে গেছে। আর খুলবে না।

এই নিয়ে নীলির সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। সে মালার কাছে মাঝে মাঝে যায়। মালাকে পড়াশুনায় সাহায্য করে। বলে, "মালা সত্যি বিশ্বাস করে যে রূপকথার রাজপুত্র একদিন

আসবে। কিন্তু তাকে যখন জিজ্ঞাসা করি কেমন করে রাজপুত্রকে চিনবে, কী কী লক্ষণ দেখে, সে তখন চুপ করে থাকে। উত্তর দিতে পারে না। ভয় হয়, দাদা, একদিন একটা বাজে লোক কি পাজি লোক এসে তার হাত থেকে রাজপুত্রের পাওনা মালাগাছি নেবে। পরে অবশ্য সে টের পাবে, কিন্তু ও মালা একবার দিলে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।"

ও ভয় কেবল নীলির মনে নয়, আমার মনেও ছিল। ভাবতুম মালার বাবার চেয়ে মালার মা-ই তার প্রকৃত বন্ধু। বাবা তাকে রূপকথার পাষাণ রাজপুরীতে ঘুমন্ত রাজকন্যা করে রেখেছেন, সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে কবে তার রাজপুত্র আসবে। আর তার মা তাকে জাগাতে চান, তার স্বপ্নের ঘোর কাটাতে চান। এই বাস্তব দুনিয়ায় কেমন করে চলতে হয় ফিরতে হয় তা শেখাতে চান। জানাতে চান কত ধানে কত চাল। সে যদি কোন্ জিনিসের কত দাম তার খোঁজ না রাখে তা হলে পদে পদে ঠকবে। এমন লোকও থাকতে পারে যে তাকে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচবে। এ বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে রূপকথার ধরন ধারন খাটে না।

এক এক সময় মালাকে দেখে মনে হতো সে রূপকথার কিরণমালার মতো অকুতোভয়ে মায়াপাহাড়ের অভিমুখে চলেছে। আনতে হবে তাকে সোনার শুকপাখী, মুক্তা ঝরার জল। সে ঠিক ঘুমন্ত রাজকন্যা নয়। সে বীরবেশী

রাজকন্যা। তার বাবা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন কার নাম সত্য কার নাম অসত্য, কার নাম ন্যায় কার নাম অন্যায়, কার নাম উচ্চ কার নাম তুচ্ছ, কার নাম সার কার নাম অসার। ভাববিলাসে তার কৈশোর কাটেনি। সে আশ্রমকন্যা। স্বল্পাহারী, পরিশ্রমী, শীতে গ্রীষ্মে অকাতর। তার জীবনের ভিৎ শক্ত করে পাতা হয়েছে। ভয় কিসের?

রূপকথার রাজপুত্রকে কি কেউ পায়? মালাও পাবে না জানি। তাহলেও আমার প্রার্থনা হলো, আহা, এই মেয়েটি যেন পায়। যেন পায় তার রূপকথার রাজপুত্রকে। কেমন করে পাবে সে আমি জানিনে। তবু প্রার্থনা করে যাই, যেন পায়, যেন পায় এই একটি মেয়ে। এই একটি মেয়ে তার রূপকথার রাজপুত্রকে।

প্রার্থনা করি, কিন্তু নিঃশঙ্ক চিত্তে নয়। যা কেউ কখনো পায় না তা যদি পেতে হয় তবে তার জন্যে দাম দিতে হয় কত! ওইটুকু মেয়ে কি পারবে অত দাম দিতে? ও কি জানে, ও কি বোঝে সুখের মূল্য দুঃখ? পরম সুখের মূল্য পরম দুঃখ? ও কি পারবে অত দুঃখ সইতে? অত দাম দিতে? কেন তবে প্রার্থনা করে ওর কপালে দুঃখ টেনে আনি!

মালা আমাকে দেবুদা বলে ডাকে। আমার মালা বোনটির জন্যে আমি সুখ সৌভাগ্য কামনা করি। যেমন করি নীলি বোনটির জন্যেও। আমি চাই তাকে দুঃখ দুর্গতি থেকে রক্ষা করতে। যেমন চাই নীলিকেও। কিন্তু তা বলে আমার সেই

প্রার্থনার ভাষা বদলে দিইনে। বলিনে, মালা যেন একটি ভালো বর পায়, একটি ভালো ঘর পায়। যেন শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটায়।

নীলির জন্যেও কি এ ভাষায় বলি? না, তার জন্যেও না। কারো জন্যে না। এ জগৎ যাঁর সৃষ্টি তিনি যদি দয়া করে দেন এসব তবে উত্তম। না দিলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যাব না। নিজেরাই এর উদ্যোগ আয়োজন করব। সফল হই, উত্তম। না হলে নিজেদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব না। অদৃষ্টকেও এর মধ্যে টেনে আনব না। বার বার চেষ্টা করব। কোনো বিয়েকেই আমি চরম বলে স্বীকার করিনে। এক বিয়ে ব্যর্থ হলে সে বিয়ে ভেঙে দেবার দাবী রাখি, তার পর আরেক বিয়ের কথা ভাবি। পড়ে পড়ে সহ্য করতে তোমাকে বলছে কে? ভগবান? কই, হিন্দু পুরুষকে তো তিনি তা বলেন না।

মানুষ সুখ শান্তির জন্যে সমাজ গড়ে, পরিবার গড়ে। সুখ শান্তি না পেলে আবার ভেঙে গড়ে না কেন? কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে যে সুখ শান্তি না পেলেও সমাজকে পরিবারকে আস্ত রাখতে হবে? ধর্ম? সেইজন্যে ধর্মের উপর থেকে একালের মানুষের শ্রদ্ধা চলে গেছে। শ্রদ্ধা ফিরে আসবে তখনি, যখন ধর্ম বলবে সুখ শান্তির জন্যে ভেঙে আবার গড়। ভাঙনটাও ধর্ম, যদি পুনর্গঠনের জন্যে হয়। আর সেই পুনর্গঠন হয় মানুষের সুখ শান্তির জন্যে।

আমার নীলি বোনটিকে আমি ছবি আঁকতে শেখাচ্ছিলুম, যাতে সেও আমার মতো সৃষ্টির আনন্দ পায়। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়ায়। তার পর বিয়ে করতে চায় করবে। সুখী না হয় ভেঙে দেবে। ইচ্ছা হয় আবার করবে।

নীলির জন্যে আমার প্রার্থনা ছিল, নীলি যেন পরাজিত না হয়। যেন পরাজয় মেনে না নেয়। তার সুখ শান্তির আশা যেন তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে। সে যেন বিয়ের জন্যে বা বিয়ের ঠাট বজায় রাখার জন্যে আপনাকে ছোট হতে না দেয়।

নীলির উপর আমার ভরসা ছিল সে কারো পায়ে লুটিয়ে পড়বে না। পতিরও না পতিকুলেরও না। মা'র মেয়ে তো? মা'র কাছে সে ও-শিক্ষা পেয়েছিল। মা'র দৃষ্টান্ত দেখে। তবে মা তাকে এ-শিক্ষা দেননি যে স্বামী আরেক জনকে বিয়ে করলে স্ত্রীও আরেক জনকে বিয়ে করতে পারে, করলে সেটা অধর্ম নয়। মা বলতেন, এক পক্ষ যদি অন্যায় করে অপর পক্ষ কেন পালটা অন্যায় করবে? করবে অসহযোগ, করবে সত্যাগ্রহ। তাই তিনি করে এসেছেন। এখনো তাঁর আশা আছে যে বাবা নিজের ভুল কবুল করবেন।

কবুল করলেই বা হবে কী? বাবা আবার বিয়ে করেছেন। দুটি মেয়ে, একটি ছেলে হয়েছে। সবাই মিলে মিশে মনের সুখে বাস করবে এ কি কখনো সম্ভব! মা এ-কথা জানেন। সেইজন্যে তাঁর চোখের জল শুকোয়নি। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি

দৃঢ়নিশ্চিত যে অসহযোগের যথেষ্ট কারণ ছিল। নিজের সংসারে রানীর মতো থাকতে পারলে গরিবের বৌ হয়েও সুখ আছে। বাঁদির মতো থাকতে হলে বড় লোকের বৌ হয়েও সুখ নেই। একতরফা ত্যাগস্বীকার কি সারাজীবন চলে? এলো একদিন একটা ব্রেকিং পয়েণ্ট। মা চলে এলেন আমাদের নিয়ে। বাবা করলেন আরেকবার বিয়ে।

এত বড় একটা করুণ অভিজ্ঞতার পরও মা বিশ্বাস করেন গুরুজনের নির্বন্ধে। নীলি নিজের পছন্দমতো বিয়ে করবে এ তিনি ভাবতেই পারেন না। এতে নাকি সুখ হয় না। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করব যে, আমার হাতে সাক্ষীপ্রমাণ থাকলে তো? নিজের পছন্দমতো বিয়ে করেও কি বড় কম মেয়ে অসুখী হয়েছে? ইউরোপে দেখে এলুম অনেকগুলি উদাহরণ। আমার নিজের অভিজ্ঞতাই আমার যুক্তির বিপক্ষে যাবে। বিয়ে করিনি, কিন্তু করলে কি ও-ছাড়া আর কোনো পরিণাম হতো?

ওদিলকে আমি দোষ দিইনে। জীবনে সুখী হতে কে না চায়! আমাকে নিয়ে সুখী হবার আশা থাকলে সে কেনই বা আর কারো কথা ভাবত? আর্টিস্টরা এমনিতেই সৃষ্টিছাড়া মানুষ। তাদের সঙ্গে ঘরসংসার করা দুরূহ ব্যাপার। তাদের নিয়ে সুখী হওয়া দুঃসাধ্য। তাদের সময় নেই অসময় নেই দিন নেই রাত নেই। "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর", তাদের মুখেই এটা মানায়। আর সব মানুষ যখন ঘুমিয়ে তখন

তারা জেগে। আর সব মানুষ যখন জেগে তখন তারা যোগে। শিল্পীর স্ত্রী হওয়াও একটা শিল্প। কেউ যদি হয় অনিচ্ছুক বা অক্ষম তাকে তার বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়াই শ্রেয়।

বাবাকে ও ছোট মাকে আমি এড়িয়ে এড়িয়ে চলি। তাঁরাও আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু ছোট ছোট ভাইবোনগুলি কী দোষ করেছে? বাণী আর কল্যাণী আর কানু এদের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। আমার স্টুডিওতে আসে। বাসাতেও। তবে ঠাকু'মার সঙ্গে তো ও ভাবে দেখা হবে না। মাঝে মাঝে ও বাড়ীতে যাই। তখন নীলির বিয়ের কথা উঠবেই। আমার বিয়ের কথাও। আমার বিয়ের প্রসঙ্গ বেশী দূর এগোয় না। সকলেই জানে আমি চাকরি করিনে। দিন আনি, দিন খাই। কিন্তু নীলির বেলা সেটা খাটে না।

মার্চেণ্ট অফিসে বাবার অসামান্য প্রতিপত্তি। কর্মপ্রার্থীরা রোজ সকালে তাঁর দরজায় হাজিরা দেয়। তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলেদেরও দেখা যায়। ইচ্ছা করলে তিনি নীলির জন্যে স্বয়ংবর সভা ডাকতে পারতেন। নীলি যার কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিত তিনি তার কণ্ঠে বাকলেস বেঁধে দিতেন। বড়বাবুকন্যা ও বড় চাকরি পেয়ে সে আনন্দে ল্যাজ নাড়ত। আহা, তার চেয়ে প্রার্থনীয় আর কী হতো! তেমন আভাসও তিনি দিয়েছিলেন নীলিকে। নীলি প্রায়ই যেত ও বাড়ীতে। সকলের সঙ্গে ওর সদ্ভাব।

কিন্তু নীলি কী বলে, শুনবে? নীলি বলে, "ম্যাচ করে

যদি আমার বিয়ে দেওয়া হয় তবে আমার বর হবে হাজার টাকা মাইনের চাকুরে বা এক হাজারী মনসবদার। আর ভালোবেসে যদি আমাকে বিয়ে করতে দেওয়া হয় তবে আমরা দু'জনে মিলে উপার্জন করে সংসার চালাব, যার যতটুকু সাধ্য।"

বাবা পেছিয়ে যান। ঠাকু'মাও মাথায় হাত দিয়ে বসেন। ছোট মা নীলির পক্ষ নেন। মা শুনতে পেয়ে চোখের জল ফেলেন। আমার দিকে তাকান। আমি নিঃস্পন্দ। সুখী নই বলে সুখী করার জন্যে আমি ব্যাকুল নই। সুখী করার কৌশল আমার জানা নেই। কী করলে আমার দুঃখিনী মা সুখী হন তা আমি জানিনে। তাঁর ধারণা নীলির আর আমার বিয়ে হয়ে গেলে তাঁর মরা গাঙে সুখের বান ডাকবে। কিন্তু সে ধারণা ভুলও হতে পারে।

নীলিকে আমার বলা আছে সে যেদিন বিশেষ কাউকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইবে আমাকে বললেই আমি মাকে রাজী করাব। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভালোবেসে বিশেষ কেউ তাকে বিয়ে করতে চায়নি। সে যে মালার মতো রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখে তা নয়। সে আমারি মতো বাস্তববাদী। কিন্তু তারও হৃদয় বলে একটি পদার্থ আছে। হৃদয় চায় হৃদয় বিনিময়। হৃদয় দিয়ে হৃদয় পাবে কি না বলবার সময় এখনো আসেনি। আরো দু'পাঁচ বছর সবুর করলে ক্ষতি কী? ইতিমধ্যে নিজেও তো যোগ্য হয়ে থাকবে। জীবনসংগ্রামের যোগ্য।

কতকটা পরিহাস ছলে কতকটা সত্যি সত্যি নীলিকে বলি,

"যোগ্যতা বলতে মেয়েদের বেলা বিবাহযোগ্যতাও বোঝায়। তার জন্যে শুধু লেখাপড়া বা গৃহকর্ম বা কলাবিদ্যা যথেষ্ট নয়। ফরাসিনীদের মতো রূপচর্চা প্রসাধনচর্চাও করণীয়। অলিভ অয়েল মাখিস্।"

তা শুনে নীলি বলে "বৃথা। বৃথা। বেণাবনে মুক্তো ছড়ানো। বাংলাদেশের কালা আদমীরা ঠিক দক্ষিণ আফ্রিকার গোরা আদমীদের মতোই বর্ণান্ধ। তুমি মানবে কি না জানিনে, কিন্তু এ দেশের বিয়ের বাজারে একটা প্রচ্ছন্ন 'কালার বার' আছে। আমার তো সন্দেহ হয় যে এ-দেশের ছেলেদের ভালোবাসাও বর্ণনির্ভর।"

বলতে যাই, "অথবা স্বর্ণনির্ভর।" কিন্তু আমিও তো এ-দেশের ছেলে। অভিযোগটা আমারও গায়ে লাগে। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলি, "শ্যামা কি গৌরীর চেয়ে কম সুন্দর। আমার তো মনে হয় ভারতীয় শিল্পীদের রূপধ্যান শ্যামাতেই সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত। তাঁর সম্বন্ধেও অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারা যায়, নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী। কিন্তু ও-কথা শুনলে আবার ধর্মান্ধরা ক্ষেপে যাবেন।"

নীলি হেসে বলে, "প্যারিসে বসে বসে নগ্নমূর্তি আঁকতে আঁকতে তোমার চোখ ঝলসে গেছে। শিব ঠাকুর কিন্তু এ-দেশের ছেলে। তাই কালীর সঙ্গে ঘর করেন না, গৌরীর সঙ্গেই থাকেন। মাথায় করে রাখেন যাঁকে তিনিও যমুনা নন, গঙ্গা। যাঁর জল

কালো নয়, শাদা। না, দাদা, তুমি যাই বল, আমরা এ দেশের মেয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করি।"

আছে হয়তো এর পিছনে কোনো আশাভঙ্গ। খোঁচাতে যাইনে। তবে রয়ে সয়ে নীলিকে আমার প্যারিসের আখ্যায়িকা শোনাই। বলি, "কে যে কী দেখে ভালোবাসে তা কেউ জানে না, জানতে পারে না। সে রহস্য ঈশ্বরের মতোই দুর্জ্ঞেয়। মাইকেলের মতো একটি কালো রঙের পুরুষকেও পর পর দুটি গৌরবর্ণ নারী ভালোবেসেছিলেন। তুই তো তাঁর মতো কালো নয়। তোর আশা আছে। কিন্তু ভালোবাসা পাওয়াটাই তো সব কথা নয়। পেয়ে রাখতে পারে ক'জন? যেখানে দু'জনেই দু'জনকে চায় সেখানে কিছুই তাদের মাঝখানে দাঁড়াতে পারে না। না ধর্ম, না জাতি, না বর্ণ, না স্বর্ণ। কিন্তু কে জানে কখন তৃতীয় একজন এসে দাঁড়াতে পারে। আমি সুখী যে আমার বিয়ের আগেই এটা ঘটেছে, বিয়ের পরে নয়। নইলে কি আমার মুখ দেখানোর জো থাকত? তা হলেও আমি সুখী হতুম এই ভেবে যে এমন কিছু আমি করিনি যার জন্যে সত্যি লজ্জিত হতে পারি। লোক লজ্জাটা তো আসল লজ্জা নয়। যে জগতে আমরা বাস করি সে জগতে তৃতীয় জনও আছে, তারও দাবী আছে। প্রেমের দাবী। এ কথা মনে রাখলে অনেক দুঃখ বাঁচে, বোন। মনে রাখিস্, মনে রাখিস্।"

নীলির মনের গভীরে বদ্ধমূল যে বর্ণ কমপ্লেক্স তা কি একদিনে যায়! সে আমাকে পালটা বোঝায় যে আমি ভ্রান্ত।

ওদিল নাকি আমাকে তত দূর ভালোবাসেনি যত দূর ভালোবাসলে একটি কালো রঙের পুরুষকে বিয়ে করা যায়। এবং কালা পানী পার হওয়া যায়। তখন তাকে নিয়ে যেতে হলো আমার বন্ধু সিতাংশুর বাড়ী। সেখানে আলাপ করিয়ে দিতে হলো ডেনমার্কের মেয়ে কাবিনের সঙ্গে। ওদিলের চেয়ে আরো ধবধবে। নীলির বিশ্বাস হলো যে বর্ণ থেকে যে দুঃখ আসে সেটা সকলের বেলা নয়, কিন্তু তৃতীয় জনের প্রবেশ থেকে যে বেদনা সেটাই সর্বত্রিক।

"কী ভয়ঙ্কর জগতে আমরা বাস করছি!" এই হলো নীলির আতঙ্কিত প্রতিক্রিয়া।

"কেন রে! অত ভয়ের কী আছে।" আমি তাকে সাহস দিতে গেলুম।

"এর পদে পদে তৃতীয় জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।" উত্তর দিল নীলি।

"তা বলে ট্রাজেডী তো ঘরে ঘরে ঘটছে না। ক্বচিৎ এক আধ জায়গায় ঘটে।" আমি তাকে আশ্বাস দিতে চাইলুম।

"না, দাদা, পর্দা উঠিয়ে দিয়ে ভালো কাজ করেছেন না দেশের নেতারা। বাইরে মেলামেশার এত বেশী সুযোগ ভালো নয়।" নীলি গম্ভীরভাবেই বলল।

"তা হলে তো মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষার সুযোগও হারায়। বহুমুখী জীবিকার সুযোগও। মেয়েদের ঘরে বন্ধ রেখেও কি

ট্র্যাজেডী এড়ানো যায়? যা হবার তা হবেই।" একটু অর্থপূর্ণ ভাবে তাকালুম।

ইঙ্গিতটা মর্মভেদ করল। নীলি মাথা নিচু করে বলল, "তা সত্ত্বেও আমি মনে করি ম্যাচ করে বিয়ে করাই ভালো। তাতেই দুঃখ কম। মা বাপকে দোষ দিয়ে অদৃষ্টকে দায়ী করে গায়ের জ্বালা জুড়োয়। আমাদের মা মাসিমাদের জগৎ এমন ভয়ঙ্কর ছিল না। ট্র্যাজেডী তো ঘরে ঘরে ঘটত না। কচিৎ এক আধ জায়গায় ঘটত।" এই বলে নীলিমা আমারি উক্তি আমারি গায়ে ছুঁড়ে মারল।

"তা হলে আর কী!" আমি শ্লেষ দিয়ে বললুম, "এবার বাবাকে গিয়ে সুসমাচারটা শুনিয়ে দাও। শুভস্য শীঘ্রম্। সেই সঙ্গে শর্তটাও একটু নামাও। হাজার থেকে পাঁচ শ'তে নামলে বাবা হয়তো ভরসা পাবেন। আমি কিন্তু এর মধ্যে নেই। আমি মনে করি অমন সুখের চেয়ে দুঃখ অনেক ভালো। দুর্ভাগ্যের জন্যে আমিই দায়ী, আমিই দোষী। মা বাবাকে জড়াতে চাইনে। অদৃষ্টকেও টেনে আনতে চাইনে।"

"আমার জন্মের জন্যে আমি দায়ী নই। আমার বিয়ের জন্যেও আমি দায়ী নই। জন্মদাতাই দায়ী। তা বলে অত নিচে আমি নামব না।" নীলি হেসে উড়িয়ে দিল।

নটমণ ঘিও পুড়বে না। রাধাও নাচবে না। নীলি জানে, তবু হাজার টাকার উপর জোর দেয়। বুঝতে পারি যে ওটা হাসির কথা নয়। ওর আড়ালে আছে ওর আত্মমর্যাদার প্রশ্ন।

বিয়ের বাজারে যদি বিকোতেই হয় তবে চড়া দরেই বিকোবে। নয়তো নয়। বিয়ে না করে আমি যেমন মা'র কাছে আছি সেও তেমনি মা'র কাছে থাকবে। থাকা দরকার। বৌদি তো আসছে না। মাকে দেখবে শুনবে কে? আমি আর্টিস্ট, ধ্যানসর্বস্ব। নীলি ছবি আঁকছে বটে, কিন্তু আর্টিস্ট নয়, নিতান্তই একজন নকলকার বা কারিগর। এটা অবশ্য নীলির কথা। আমার নয়। আমি বিশ্বাস করি যে ইচ্ছা করলে নীলিও আমার মতো আর্টিস্ট হতে পারে। আর আমিই বা কী এমন আর্টিস্ট।

ওদিকে ইউরোপে মহামারী আরম্ভ হয়ে গেছল। সভ্য মানুষ তো প্লেগে মরবে না। প্লেগ উঠিয়ে দিয়েছে। দুর্ভিক্ষে মরবে না। দুর্ভিক্ষ উঠিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির হাতে মরবে না। প্রকৃতির উপর খোদকারী করেছে। মরবে তা হলে কিসে? তা হলে কি সে অমর হবে নাকি? তার ওই অপরিমিত ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য নিয়ে সে যদি অমর হতে চায় তবেই হয়েছে! সমগ্র বিশ্বের ভারসাম্য নষ্ট হবে। তাই তাকে মাঝে মাঝে যুদ্ধে বিগ্রহে বিনষ্ট হতে হয়। কতকটা তার নিজের ইচ্ছায়, কতকটা বিধাতার।

যুদ্ধ আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। জানতুম যে অতগুলো দেশ যখন ওর জন্যে কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত হচ্ছে তখন তাদের প্রস্তুতিই প্রসূতী হবে যুদ্ধের। তা বলে আমি

কি কল্পনা করতে পেরেছি যে অত সত্বর তাঁর আবির্ভাব ঘটবে আর অমন ঝড়ের বেগে নাট্‌সীরা ম্যাজিনো লাইন ভেদ করে প্যারিসের পতন ঘটাবে! হায় প্যারিস! সুন্দরী নাগরী! এবার তো গাম্‌বেত্তার মতো প্রেমিক নেই। কে তোমাকে রক্ষা করতে প্রাণপণ করবে? সেবার চার মাস ধরে তুমি প্রতিরোধ করেছিলে। এবার একদিনেই আত্মসমর্পণ। মাঝখানের সত্তর বছরে ফ্রান্স আপনাকে আরো দুর্বল করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে বোঝা যায়নি। বিপ্লবের দেশ বিপ্লবের থেকে আরো দূরে সরে গেছে। তার জন্যে পরিতাপ বৃথা।

তবু আমার মনে গভীর আঘাত লাগল। আমি তো কেবল ওদিলকেই ভালোবাসিনি। ভালোবেসেছিলুম প্যারিস-কেও। আমার বন্ধুদের পরপদানত অবমাননা আমাকেও স্পর্শ করেছিল। ইচ্ছা করলেই তাঁরা প্যারিস ছেড়ে যেতে পারতেন। তাতে তাঁদের সম্মান বাঁচত। কিন্তু তাঁরা তা করবেন না। প্যারিসের টান। প্যারিসের প্রতি আনুগত্য। আমার বন্ধু সিতাংশু বলত, "প্যারিস এমন সুন্দরী যে পতিতা হলেও তার সৌন্দর্যের ক্ষয় নেই। তুমি শিল্পী, তুমি যা হারালে তার প্রতিরূপ পাবে কোথায়! এই কলকাতায়? এখানে তোমার কিছু হবে না।"

প্যারিসে থেকে গেলেও কিছু হতো না। ঝড়ের আগের হিমেল হাওয়া আমার গায়ে লেগেছিল। ঝড়ের মুখে ঝরা

পাতার মতো আমাকে উড়ে যেতে হতোই। সম্ভবত লণ্ডনে। এ ঝড় কি সেখানেও পৌঁছত না? প্যারিসের পতনের পূর্বে ইংলণ্ডের উপর আকাশ থেকে যে শিলাবৃষ্টি হলো সেই ব্রিট্‌সের মার খেয়ে কে কে বেঁচে আছেন জানিনে। আমি যে বাঁচতুম তার নিশ্চয়তা কোথায়! নিশ্চয়তা অবশ্য এ দেশেও নেই। কোন্ দিন কে যে আক্রমণ করে বসে বলা যায় না। মরতে হয় নিজের জন্মভূমিতেই মরব। ফিরে আসার সময় এ কথাও ভেবেছি। আরো ভেবেছি বিপ্লবের কথা। এবার বিপ্লব যদি কোথাও ঘটে তো ভারতবর্ষেই ঘটবে। ইতিহাস যাঁরা গুলে খেয়েছেন তাঁরাই আমাকে বলেছেন। তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্য হয় তবে বিপ্লবের দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দর্শন করব। আর স্বহস্তে অঙ্কন করব। এ বাসনা আমার অনেক দিনের। অবশ্য বিপ্লবের দিন যদি প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকি।

না। দেশে ফিরে এসে আমি ভুল করিনি। তবে এ কথাও আমি ভুলে যাইনি যে চিত্রকলার মূলস্রোত সেন নদীর কূলে প্রবহমান, গঙ্গানদীর তটে নয়। আমি চলে এসেছি বলে মূল-স্রোতটাও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসেনি। যেখানকার স্রোত সেখানেই রয়ে গেছে। নাৎসী বুটের তলায় প্যারিসের মাটি কামড়ে পড়ে আছেন যে ক'জন তাঁরাই মূলস্রোতের অবগাহী। আর্টের খাতিরে আর্টিস্টকে অনেক অপমান মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। যেমন সন্তানের খাতিরে জননীকে। আমার মা-ও

মনে মনে অনুশোচনা করেন। লোকে যখন জানতে চায় আমার কাছে, "এইটেই কি আধুনিকতম," আমি ফাঁপরে পড়ি। যদি বলি, "না," তা হলে আমার ছবি বিকোবে কোন গুণে? আমি তো দেশধর্মী নই। আমি যুগধর্মী। অথচ মূলস্রোত থেকে অত দূরে সরে এসে কোন্ মুখে বলি, "হাঁ"? তবু তো এত দিন প্যারিসের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। পত্রিকা আসত। ফোটো আসত। প্রতিলিপি আনিয়ে নিতুম। বই কিনতুম। এখন সব সম্পর্ক ছিন্ন হলো। মূলস্রোত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি তা হলে করি কী?

কেন? গোগ্যাঁ কী করেছিলেন? তাহিতি তো পৃথিবীর উলটো পিঠে। আমার চেয়ে ঢের বড় শিল্পী। আমার চেয়ে ঢের বেশী আধুনিক। তাঁর তো লেশমাত্র পিছুটান ছিল না। তিনি তো ভুলে যেতে পেরেছিলেন। হাঁ, গোগ্যাঁ মূলস্রোত থেকে স্বেচ্ছায় সরে গেছলেন। কারণ তিনি আরো মৌলিক স্রোতের সন্ধান পেয়েছিলেন। সে স্রোত আদিকাল থেকে আগত। আদিকালেই অবস্থিত। অথচ জীবন্ত। আমাদের এ দেশেও সেরূপ একটি আদিকাল থেকে প্রবহমান মৌলিক রস-ধারা ছিল। এখন নেই। থাকলেও তার স্থিতি আদিকালে নয়। আধুনিক কালেও নয়। তার মধ্যে জীবনের ভাগ অল্প। তাকে জীবন্ত না বলে নিবন্ত বলাই সঙ্গত। সাঁওতালরাও সে সাঁওতাল নয়, গোন্দরাও সে গোন্দ নয়, নাগারাও সে নাগা নয়, লেপচারাও সে লেপচা নয়। তাহিতিও কি আর সে

তাহিতি আছে ? যেখান থেকে পালাব সেইখানেই পৌঁছব। গিয়ে দেখব সভ্যতা আমার আগেই হাজির হয়েছে। এমন মিশাল ঘটিয়েছে যে আদিমদের মধ্যে আর আদিমকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ইভকেও সাপের দল আপেল খাইয়ে দিয়েছে। গোগ্যাঁর ভাগ্যে যে সুখ ছিল সে সুখ চিরকালের মতো অস্ত গেছে। উষ্ণতা যদি না থাকে নগ্নতা নিয়ে আমি কী করব ?

ও ভুল আমি করিনি। ইয়ারদের হাসিতামাশার পাত্র হয়েছি। এমন কি মেয়েরাও আমাকে কৃপার পাত্র মনে করেছে। তা সত্ত্বেও আমি কাচের বদলে কাঞ্চন সঁপে দিইনি। ওরা যাকে সুখ বলে তার মধ্যে উষ্ণতা কোথায় ? হৃদয় উষ্ণ নয়, দেহ উষ্ণ নয়। ওর চেয়ে বরফজলে স্নান করা আরামের। যে উষ্ণতা প্রাণ সৃষ্টি করে শিল্পও তার সংস্পর্শ পেলে বাঁচে। কিন্তু সূর্যের আলোর উষ্ণতা চাঁদের আলোয় নেই। 'নগ্নতা' 'নগ্নতা' করে প্যারিসের শিল্পীগুলো মোলো। সবাই নয় অবশ্য। বোঝে না যে দু'রকম নগ্নতা আছে। সদ্যোজাত শিশুর নগ্নতা। সে নগ্নতা জীবনধর্মী। চিতার আগুনে নর-দেহের নগ্নতা। সে নগ্নতা মরণধর্মী। উত্তাপ দিয়ে তাকে ঘিরে দিলে কী হবে ? ভিতরে তার উষ্ণতা নেই। শিল্পে তাকে রূপ দিতে পারো। কিন্তু তাপ দেবে কী মন্ত্রবলে ? আঙ্গিক ? আঙ্গিক এখানে কোন কাজে লাগবে ? শেষপর্যন্ত শিল্পীর সম্বল তার নিজের হৃদয়ের, নিজের প্যাশনের উষ্ণতা। অবশ্য ও

জিনিস সোনায় সোহাগা নয়। কচিৎ ওর সাক্ষ্য পাই। বহুভাগ্যে মেলে।

আধুনিকতাকে আমি কিসের সঙ্গে তুলনা করব? সূর্যের আলোর সঙ্গে নয়। চাঁদের আলোর সঙ্গে নয়। ওই স্রোতের সঙ্গে। প্রবাহের সঙ্গে। সারা পৃথিবী জুড়ে এর বিস্তার। কিন্তু মূল স্রোত সর্বত্রব্যাপী নয়। অগণ্য সাধকের পরম্পরাগত সাধনার ফলে পশ্চিম ইউরোপেই শিল্প ও সাহিত্যের মূল স্রোত। তার থেকে স্বেচ্ছায় সরে এলেও আমি একেবারে বিযুক্ত হতে চাইনি। এই মহাযুদ্ধ আমাকে বিয়োগব্যথা দিল। আমার ছবি যে আধুনিকতম নয় এ যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। বেদরদী সমালোচকরা যখন নুন ছিটিয়ে দেয় তখন আমি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করি। আর দেশধর্মী সমালোচকরা আমাকে ফেরঙ্গ বলে আমলই দিতে চান না। আমি যে তাঁদের স্রোতে গা ভাসাইনে।

আমরা এক পালকের পাখীরা মিলে ছোট খাটো একটা ঝাঁক বাঁধি। সমালোচকদের খোঁচা আমাদের সকলের গায়ে বাজে বলে আমরা নিজেরাই নিজেদের তারিফ করি। "ওরা বলছে?" "কী বলছে?" "বলতে দাও।" এই হলো আমাদের উত্তর। বাচনিক উত্তর। আসল উত্তর যেটা সেটা তো কথায় নয়, কাজে। যা আঁকছি তা যদি সুন্দর হয়ে থাকে সত্য হয়ে থাকে তবে তাকে না দেখে কে? ছবি যদি দর্শনীয় হয়ে থাকে তবে লোকে ভিড় করে দেখবেই। ওটা

একটা মিথ্যে বিপদ। ওটার জন্যে আমরা পরোয়া করিনে। কিন্তু আর একটা বিপদ আছে। সেইটেই সত্যিকার বিপদ।

তোমরা সাহিত্যিকরা বিদেহী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারো। আমরা চিত্রকররা ভাস্কররা কি তা পারি? দেহ বাদ দিলে ছবির বা মূর্তির কী থাকে? নগ্ন দেহই বা না আঁকব কেন? না গড়ব কেন? অবশ্য তার বেসাতি করে যারা বড়লোক হতে চায় তাদের কথা আলাদা। তাদের হয়ে জবাবদিহি করা আমাদের সাজে না। পর্নোগ্রাফিকে আমরা আর্ট বলিনে। তা বলে নগ্নতাকে সচেতনভাবে বর্জন করাও কি আর্ট? আমরা যদি গোড়া থেকেই সমালোচনার ভয়ে আর্টের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করি তা হলে ছবি হতে পারে, মূর্তি হতে পারে, কিন্তু আর্ট হবে না। তাই যদি না হলো তবে আমরা কিসের জন্যে জীবন উৎসর্গ করলুম? ভালো ছেলে হওয়াই যদি মনোগত অভিপ্রায় তবে আর্ট ছাড়া কি দুনিয়ায় আর কোনো উপজীব্য ছিল না?

ছেলেবেলায় আমার ঠাকু'মা আমাকে বলতেন, যাকে রাখ সেই রাখে। বড় হয়ে আমিও আমাকে বলে থাকি, যাকে রাখ সেই রাখে। আমি যদি আর্টকে রাখি আর্ট আমাকে রাখবে। কিন্তু লোকের যদি ষত্ব ণত্ব জ্ঞান না থাকে, তারা যদি আর্টকে ভাবে পর্নোগ্রাফি আর পর্নোগ্রাফিকে ভাবে আর্ট তবে তাদের মার পড়বে নির্দোষীর পিঠে আর হার ঝুলবে দোষীর গলায়। তার লক্ষণ দেখে মনের জোর কমে

যায়। মেলোমশায়ের কাছে যাই নৈতিক সমর্থনের খোঁজে। শিল্পের যেটা অপরিহার্য অঙ্গ তার নাম মানবের অঙ্গ। এ তত্ত্ব তিনি মানেন। তবে তার সঙ্গে আত্মাও থাকবে। নইলে অপূর্ণতা রয়ে যাবে। নগ্নতা সম্বন্ধেও তাঁর বিকার নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে পূর্ণতা থাকা চাই। পূর্ণতাই লক্ষ্য। পূর্ণ সৌন্দর্য। সেই পূর্ণতা যেখানে আছে নগ্নতা সেখানে পূর্ণতার মধ্যেই আছে। তাকে বাদ দিলে পূর্ণতাও থাকে না। যেমন গ্রীক ভাস্কর্যে।

প্রাচীন গ্রীকরা প্রাচীন ভারতীয়রা রসিক ছিলেন। মধ্যযুগেও রসিকজনের অভাব ঘটেনি, কিন্তু সাধুজনের প্রভাব সাধারণের রসবোধকে আচ্ছন্ন করেছিল। আধুনিক যুগ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হয়নি। সত্যিকার বিপদ এইখানেই।

চার

মেসোমশায় তখনো তাঁর নিজের জীবনের পুনরাবৃত্ত নিয়ে চিন্তাকুল। আমাকে খুলে বলতেন না, কাউকেই না, কোন্‌খানে তাঁর ব্যথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন চাকরি তো তিনি পায়ে ঠেললেন। আবহাওয়া তাঁর পছন্দ নয়। অমন আবহাওয়ায় কাজ হয় না।

ওদিকে মাসিমার সেই এক ভাবনা, এক ধ্যান। মালার ভালো বিয়ে দিতে হবে। জগৎ জুড়ে যুদ্ধ হতে পারে, দেশ জুড়ে সত্যাগ্রহ হতে পারে, মানবসভ্যতা টলমল করতে পারে, কিন্তু মাসিমা হলেন সেই আদ্যিকালের ভবী। ভবী ভোলে না। ভোলে না যে তার মেয়ের বয়স দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, এই বেলা তাকে পাত্রস্থ করতে না পারলে পরে আর ও মেয়ের ভালো বিয়ে হবে না।

আমার সাহায্য চেয়ে সে-বার তিনি নাকাল হয়েছিলেন। সেটা যদিও আমার দোষে নয় তবু আমার সঙ্গে সেটার কাকতালীয় সম্পর্ক ধরে নিয়েছিলেন। আর আমাকে বলতেন না। তাঁর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন তো কলকাতা শহরে বড় কম নেই। তাঁদের বলতেন। তাঁরা চেষ্টাচরিত্র করতেন। ভালো মন্দ মাঝারি সব রকম ছেলে একে একে হাজির হতো। অবশ্য পার্টিতে নিমন্ত্রণছলে।

আমার মালা বোনটি কিন্তু এমন অবুঝ। সে-বার যেমন রাজার ছেলেকে ডাব পাড়তে বলে অপ্রস্তুত করেছিল তেমনি সলিসিটারের ছেলে, ব্যারিস্টারের ছেলে, ডাক্তারের ছেলে, হাকিমের ছেলে, ইঞ্জিনীয়ারের ছেলে, এদের এক একজনকে এক একটি অসাধ্য সাধন করতে বলে অপদস্থ করেছে। অসাধ্য সাধন? নয় তো কী! ভদ্রমহিলার রুমাল মাটিতে পড়ে গেলে কুড়িয়ে আনা সুসাধ্য সাধন। কিন্তু হঠাৎ এক পাটি চটি ছিঁড়ে গেলে সেটিকে বিশেষরূপে বহন করা বিবাহের জন্যে অসাধ্য সাধন নয় কি? গ্যালাণ্ট হলে তাও পারা যায়, কিন্তু ছেঁড়া কাগজের টুকরো, কমলালেবুর খোসা ইত্যাদি লিটার কুড়োনো কি ভদ্রলোকের ছেলের সাজে? মালাকে বিয়ে করতে চাইলে মালী হতে হবে। য়্যাঁ?

বেচারিদের মাথা কাটা যায়। মুখ লাল হয়ে ওঠে। তার পরে অন্তর্ধান। মাসিমা মেয়েকে দাবড়ি দেন। মালা করুণ চোখে তাকায়। সে-চোখ দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে, মালা ইচ্ছে করে বিস্কুটটা ফেলে দিয়েছে বা চটির পাটি ছিঁড়ে ফেলেছে। বরং স্বীকার করবে অমন হয়ে থাকে। মাসিমা কিন্তু হাড়ে হাড়ে জানেন ফী বার অঘটন আপনি ঘটে না, ঘটতে পারে না। মালাই ঘটিয়েছে। আর যদি আপনি ঘটেও তবু চুপ করে থাকলেই হয়। ভদ্রলোকের ছেলেকে এটা সেটা কুড়োতে বলা কেন? মালা এর উত্তরে বলে সব মানুষই সমান; সব শ্রমই সম্মানের। মাসিমা রেগে যান।

রায় বাহাদুরের ছেলেকে ঝুল ঝাড়তে বলে মালা যে কাণ্ডটি বাধাল সেটি তো দৈব ঘটনা নয়। ছেলেটি সত্যি খুব ভালো। মালার মুখ রক্ষা করল, ঝুল ঝাড়ল! কিন্তু তার পর থেকে অদৃশ্য। মাসিমা ফেটে পড়লেন। মেয়েকে বললেন, "একটা কথা আছে, মালু। অতি ঘরন্তী না পায় ঘর। কোনো বরই যার মনে ধরে না তার বিয়ে হয় না। তোমাকে একদিন এর জন্যে পশতাতে হবে, মা!"

মালা বলল, "বিয়ে না হলে পশতাতে হবে এমন কী কথা আছে? আমাদের লেডী প্রিন্সিপালের তো বিয়ে হয়নি। কই, তাঁকে তো দিন দিন শুকিয়ে যেতে দেখিনে।"

তা শুনে হাসাহাসি পড়ে গেল। মাসিমার যুক্তি এক কথায় খণ্ডিত হলো।

তিনি মেসোমশায়কেই এর জন্যে দায়ী করলেন। মেয়েকে ছেলেবেলা থেকে এমন কুশিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সে ভদ্র-লোকের ছেলেদের অসাধ্য সাধন করতে বলে। কেন তারা তা করবে? কী এমন রূপসী গুণবতী ধনীর মেয়ে যে তার জন্যে ব্যারিস্টারের ছেলে চটি জুতো কুড়িয়ে আনবে, জজসাহেবের ছেলে লিটার কুড়োবে। যিনি তাকে কুশিক্ষা দিয়েছেন তিনি কেন দারুব্রহ্ম সেজে ঠুঁটো হয়ে বসে আছেন? দিন কেমন করে দেবেন মেয়ের বিয়ে। ভালো বিয়ে।

মেসোমশায় বলেন, "মালা এখন সাবালিকা হয়েছে। কলেজে পড়ছে। ওর যদি বিয়ে করতে ইচ্ছা না থাকে আমরা

কী করতে পারি! সবুর করো। আগে ওর পড়াশুনো শেষ হোক। বয়স এমন কী হয়েছে!"

মাসিমা বলেন, "তা বলে এতগুলি ভালো ভালো পাত্র অকারণে হাতছাড়া হবে? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা তোমার স্বভাব। তোমার মেয়েরও স্বভাব হবে?"

তাঁদের মতবিরোধ ধীরে ধীরে দাম্পত্য কলহের ধার ঘেঁষে চলেছিল। মাসিমার স্থির বিশ্বাস মেশোমশায় প্রশ্রয় দেন বলেই মালা অমন বেপরোয়াভাবে সুপাত্রদের বরখাস্ত করে। তিনি যদি তাঁর মেয়েকে শাসন না করেন তবে মাসিমার সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হবে। ওর বয়সের প্রত্যেকটি মেয়ের এক এক করে ভালো বিয়ে হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। একদিন দেখা যাবে ওর বয়সের গাছপাথর নেই। তখন সে যে কী বিপদ!

সে যে কী বিপদ সেটা মেসোমশায় অনুধাবন করতে পারেন না। মেয়ে যদি অনূঢ়া থেকে যায় তিনি দুঃখিত হবেন নিশ্চয় কিন্তু মেয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বে বিয়ে হলেই কি তিনি সুখী হবেন? জীবনটা তাঁর নয়, মাসিমারও নয়। জীবনটা মালার। তার জীবন সে কেমন ভাবে খরচ করবে সেটা তারই উপর ছেড়ে দেওয়া ভালো। মাসিমা কিন্তু ও তত্ত্ব মেনে নিতে নারাজ। তাঁর মতে ওটা ভালো নয়, মন্দ।

এখন মেয়ের ইচ্ছা নেই বলে মেয়ে বিয়ে করবে না, কিন্তু যখন তার ইচ্ছা হবে তখন কি তার জন্যে সুপাত্ররা বসে

থাকবে? না তাদের কেউ বসে থাকতে দেবে? দু'মিনিট দেরি করে পৌঁছলে বাজার থেকে মাছ উধাও হয়ে যায়। তার পর তুমি সারা দিন সন্ধান করে রুই কাতলা ইলিশ পাবে না, পেলে হয়তো পাবে আড় কি বাচা কি বোয়াল। ইহাই নিয়ম। ইংরেজীতে বলে সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। আমরা হলে বলতুম সময় আর সুপাত্র কারো জন্যে সবুর করে না।

মাসিমা আমার কাছে আফসোস জানান। "তুমি, বাবা, মালাকে একটু বোঝাও। নীলি তো ওর খুব বন্ধু। সেও যদি একটু বোঝায়।"

মালাকে আমি এ বিষয়ে কিছু বলিনে, বলতে পারিনে। নীলি বলে। তখন মালা জবাব দেয়, "রূপকথার রাজপুত্তুর যখন আসবে তার আগেই যদি আমি পরের হয়ে থাকি তবে তিনটি জীবন ব্যর্থ হবে। যে কর্মের পরিণামে তিনটি মানুষ অসুখী সেটা কি শুভকর্ম?"

"আর রাজপুত্তুর যদি না আসে?" নীলি প্রশ্ন তোলে।

"যদি আসে।" মালা কাটান দেয়।

"আহা! একবার মেনে নে না। যদি না আসে?" নীলি টেনে টেনে বলে।

"তুই মেনে নে না। যদি আসে?" মালা আরো টেনে টেনে বলে।

"কেমন করে জানলি যে আসবে?" নীলি ঘুরিয়ে জেরা করে।

"কেমন করে জানব যে আসবে না?" মালা কাটিয়ে যায়।

এ তর্কের মীমাংসা নেই। যার যা বিশ্বাস। নীলির বিশ্বাস রূপকথার রাজপুত্রের অস্তিত্ব নেই। থাকলে তো আসবে। যারা আছে ও আসে তাদেরই একজনের গলায় মালা দেওয়াই বিজ্ঞতা। মালার বিশ্বাস রূপকথার রাজপুত্র আছে ও আসবে। তার জন্যে মালা গেঁথে তুলে রাখাই শ্রেয়। আর কারো গলায় মালা দেওয়া অপরিণামদর্শিতা। প্রতীক্ষা যদি নিষ্ফল হয় তবে সে একা অসুখী হবে। প্রতীক্ষা যদি না করে তবে তিনটি মানুষ অসুখী হবে। কোন্‌টা ভালো? একজন অসুখী না তিনজন অসুখী?

"শুনলে তো, দাদা, মালার যুক্তি?" নীলি সবিস্তারে শোনায়।

"শুনলুম। তা বলে ওই পাগলীর প্রলাপ এক কথায় উড়িয়ে দিতেও পারিনে।" আমি রায় দিই। "রাজপুত্র না থাক, এমন কেউ হয়তো আছে যাকে দেখলেই আপনার বলে চেনা যায়। সে যদি বিয়ের পরে আসে তবে তাকে পর বলে অস্বীকার করা ভীরুতা। অথচ তাকে আপনার বলে স্বীকার করাও ভয়ঙ্কর। তখন তিনটি কেন, আরো কয়েকটি মানুষও অসুখী হয়। যদি জন্মে থাকে। তার চেয়ে যতকাল সম্ভব সবুর করাই কম দুঃখের।"

বাধ্য হলে সবুর করতে নীলিও রাজী। কিন্তু একটির পর একটি সুপাত্রকে একটা না একটা ছলে নামঞ্জুর করবে এতখানি সাহস তার নেই। সাহস তো নয়, আস্পর্ধা। যার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সেই তো আপনার। জন্মে জন্মে আপনার। সে ভিন্ন আর সকলেই তো পর। বিয়ের পরে কবে কে একজন আসবে, সেই হবে আপন, সোয়ামী হবে পর? মা গো! ভাবতেও পারা যায় না। ঘেন্না করে।

মাসিমা কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। তিনি বরং শক্ত হাতে হাল ধরবেন। মেয়ের বাপ তো উদাসীন, মাও যদি উদাসীন হন তবে আর ও-মেয়ের সময়ে বিয়ে হবে না, পরে ও নির্ঘাত অপাত্রে পড়বে। তখন ও মা-বাপকেই দোষ দেবে। তার চেয়ে সময়মতো ওর বিয়ে দিয়ে দেওয়াই ভালো। ওর মত থাক আর নাই থাক। মেয়েদের মত নেওয়ার রেওয়াজ হলো কবে থেকে? যত সব সাহেবিয়ানা। সাহেবদের ভালো গুণগুলো নিতে জানে না। মন্দ গুণগুলোই নেয়। বিবাহের মতো পবিত্র ব্যাপারে গুরুজনের মতই শিরোধার্য। গুরুজন যেটুকু স্বাধীনতা দিয়েছেন সেটুকুর সদ্‌ব্যবহার করলেই মঙ্গল। ওই যে সুপাত্রদের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে দেওয়া হয়েছে ওটা কত বড় একটা প্রগতির লক্ষণ। বল, কথা বল, কিন্তু ঝুল ঝাড়তে জুতো কুড়োতে ডাব পাড়তে বোলো না। ওটা স্বাধীনতার অপব্যবহার।

মাসিমা এখন থেকে জবরদস্ত হলেন। পাত্র ঠিক করার ভার

নিজের হাতেই নিলেন। তাঁর যাকে পছন্দ তাকেই বিয়ে করবে মালা। কিন্তু মেসোমশায়ের দিক থেকে তিনি লেশমাত্র সহানুভূতি পেলেন না। কর্তা অধিকাংশ সময় মৌন। দুটো একটা কথা যখন বলেন তখন ও-প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। শীতল যুদ্ধের পূর্বাভাস।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর একদিন কথায় কথায় মেসো-মশায় আমাকে বললেন, "না। তপোবনের উপযোগী আবহাওয়া নেই। না কলকাতায়, না কলকাতার এক শ' মাইলের মধ্যে কোনো খোলা জায়গায়। স্থান নির্বাচনে ভুল হয়েছিল তাঁর। আমারও।"

আমি বললুম, "মেসোমশায়, ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?"

তিনি অভয় দিলেন। তখন আমি বললুম "শুধু স্থান নির্বাচনে নয়। কাল নির্বাচনেও। বিংশ শতাব্দী যদি খ্রীস্টপূর্ব বিংশ শতাব্দী হতো তা হলে তপোবনের উপযুক্ত আবহাওয়া আপনারা যে কোনো জায়গায় পেতেন। খ্রীস্টোত্তর হয়েই মাটি করেছে। আবহাওয়া আপনি কোনোখানেই পাবেন না।"

মেসোমশায় মাথা নাড়লেন। "আমি অতটা নিশ্চিত নই। হিমালয় এখনো আছে। ভাবছি হিমালয়ে গিয়ে বাস করব। আলমোড়ায় কি লছমনঝোলায়। মুশকিল হচ্ছে সেখানে বিজ্ঞানের উপযুক্ত আবহাওয়া নেই। কী নিয়ে থাকব?"

মনটা কেমন করে উঠল। মেসোমশায়রা তা হলে কলকাতায় থাকবেন না, আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। ক'টা

দিনেরই বা আলাপ, তবু অলক্ষে একটা স্নেহের বাঁধন তৈরি হয়েছিল। তা ছাড়া ঝড়ঝাপটার যুগে অন্তর যখন বিক্ষুব্ধ তখন শান্তির জন্যে আলোর জন্যে কার কাছেই বা যাই? মেসোমশায় ছিলেন আমার আলোকস্তম্ভ, আমার পোতাশ্রয়।

বুঝতে পারছিলুম কলকাতায় তাঁর মন বসছে না। চাকরি পেলেও না। গাছ যেমন মাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ পাতায় মানুষও তেমনি তার বাসস্থানের সঙ্গে। গৃহনির্মাণ করলেই কি সম্বন্ধ পাকা হয়? প্যারিসে তো আমার ঘরবাড়ী ছিল না। তবু তো একটা সম্বন্ধ পাতানো হয়েছিল। জীবনের সঙ্গে জীবন মিলিয়ে দিতে পারলেই মানুষ অঙ্গাঙ্গিতা অনুভব করে। মেসোমশায় তো কলকাতার জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন।

কলকাতা ছাড়তে মাসিমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। চব্বিশ পঁচিশ বছর রেঙ্গুনে কাটিয়ে এসে কলকাতায় তিনি জমিয়ে বসেছেন। এই তো তাঁর স্বস্থান। এখান থেকে নড়তে হবে শুনলে তিনি বিদ্রোহ করবেন। তলে তলে তাঁর সাধ ছিল একটি ঘরজামাই সংগ্রহ করা। মালার হাত থেকে নিজের হাতে নির্বাচনের ভার কেড়ে নিয়ে তিনি নতুন করে সে বিষয়ে উদ্যোগী হলেন। আবিষ্কার করলেন যে পাত্র তাঁর হাতের মুঠোয়।

বুধবারের পার্টিতে প্রায়ই আসত একটি ফিটফাট ধোপ-দুরস্ত ছেলে। কী করত জানিনে। চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরেজী

বলত আর পরিবেশনের সময় মাসিমার পায়ে পায়ে ঘুরত। নাম শুনেছিলুম টোগো। টোগো খাশনবিশ। টোগোর মস্ত একটা গুণ ছিল নিজের মোটরে আমার মতো পদাতিকদের তুলে নিয়ে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া। মাঝে মাঝে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে আসা। যেদিন পার্টিতে লোকজন কম সেদিন সে গাড়ী করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমার মতো গরহাজিরদের ধরে নিয়ে আসবেই। মাসিমার প্রতি আনুগত্যে তার দোসর ছিল না। বিনয়, নম্রতা, সৌজন্য, অপরের প্রতি বিবেচনায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাকে মিস্টার খাশনবিশ বললে সে অভিমান করে। বলতে হবে টোগো। আপনি বলা চলবে না। বলতে হবে তুমি। অথচ সে যে কে, কার কী হয়, তাই আমার জানা নেই।

পরে জেনেছিলুম তার মা বাপ দু'জনেই কোয়েটার ভূমিকম্পে মারা যান। সে ও তার দুই বোন কোনো গতিকে রক্ষা পায়। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাই তার এখন ঝাড়া হাত পা। ইতিমধ্যে বিলেত ঘুরে এসেছে। কিন্তু কাজকর্ম জোটেনি। দরকারও নেই। সঙ্গতি আছে। সুযোগ পেলে আর্মিতে যাবে। কিংবা নেভিতে। টাকার জন্যে নয়। য়্যাডভেঞ্চারের জন্যে। কোনো রকম বদ খেয়াল নেই। নেহাৎ সামাজিকতার খাতিরে ধোঁয়া আর পানী দুই রকম পান করে।

টোগোর পরিচয় দেবার সময় মাসিমা বলতেন, "মিস্টার

খাশনবিশ। জার্নালিস্ট।” কোন্ কাগজে লেখে তা বলতেন না। সেও চুপ করে থাকত। চাপ দিলে এড়িয়ে যেত। পরে আমাকে বিশ্বাস করে আপনি বলেছিল যে সে টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার সামাজিক সংবাদদাতা। ওরা তার নাম প্রকাশ করে না। জানাজানি হয়ে গেলে সকলে সতর্ক ভাবে মিশবে। তা হলে আর সংবাদ কী হলো? সংবাদ হলো তাই যা অসতর্ক মুহূর্তে লোকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই উপলক্ষে কলকাতার সমাজের বিভিন্ন মহলে তার গতিবিধি। কিন্তু ইতিমধ্যেই এতে তার অবসাদ এসেছে। আসল সংবাদ যেখানে উৎপন্ন হচ্ছে সেখানে তো তার প্রবেশ নেই। যেমন বড়লাটের শাসন পরিষদে বা জঙ্গীলাটের দপ্তরে বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বা কমিউনিস্ট পার্টির অন্তঃপুরে।

জাপান যখন যুদ্ধে নামল টোগো তখন যুদ্ধের ঘোড়ার মতো চঞ্চল হয়ে উঠল। ভারতীয় ফৌজ ও নৌবহর যে ভারতের বাইরে এক অনির্দিষ্ট রণাঙ্গনে প্রেরিত হয়েছে এ খবর আমরা কেউ জানতুম না। টোগো কেমন করে জানতে পেরেছিল। সেও তাদের সঙ্গে যেতে চায়। কিন্তু ভারতীয় সাংবাদিকদের হাত পা বাঁধা। চাইলেই তো চাওয়া মঞ্জুর হয় না। কমিশন পেলে ইউনিফর্ম পরে সৈনিক হতেও সে প্রস্তুত। আসল সংবাদ যেখানে উৎপন্ন হচ্ছে সেখানে গিয়ে হাজির হবার সেও তো এক উপায়। তাতে আর কিছু হোক না হোক তার কৌতূহল চরিতার্থ হবে।

জাপান যখন সিঙ্গাপুর নিল তখন টোগোর মুখে হঠাৎ শোনা গেল, "জাপানকে রুখতে হবে।" আমাদের মধ্যে সেই সব চেয়ে উত্তেজিত।

তা শুনে মাসিমা বললেন, "টোগোকে রুখতে হবে।" তিনিও সমান উত্তেজিত।

"কেন, মাসিমা, টোগোকে রুখতে হবে কেন?" জিজ্ঞাসা করলুম আমি। "সে তো জাপানী অ্যাডমিরাল টোগো নয় যে ভারত আক্রমণ করবে।"

"উহুঁ, তুমি বুঝতে পারছ না। টোগো জাপানীদের আক্রমণ ঠেকাতে চায়। অমন করলে কি ও বাঁচবে!" মাসিমার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ।

"ও না বাঁচুক দেশশুদ্ধ মানুষ বাঁচবে।" আমি ভালোমানুষের মতো বলি।

"বা! তুমি তো ওর বেশ হিতৈষী দেখছি। কোয়েটার ভূমিকম্পে ও মরতে মরতে বেঁচে গেছে। ওর মা থাকলে কি ওকে মরতে পাঠাতেন? ওর মা নেই বলে কি কেউ নেই? তোমার মা কি তোমাকে যুদ্ধে যেতে দেবেন?" মাসিমা চোখ কপালে তুললেন।

আমি শিল্পী। আমি যুদ্ধে গেলে শিল্প মরবে। কিন্তু টোগো যুদ্ধে গেলে কার কী ক্ষতি? এই হলো আমার প্রশ্ন। এর উত্তরে মাসিমা দৃষ্টি দিয়ে অগ্নিবৃষ্টি করলেন।

নীলি আমার চেয়ে বেশী জানত। শুনে আশ্চর্য হলো

না যে মাসিমা টোগোকে জাপানীদের হাত থেকে বাঁচাতে চান। বলল, "মায়ের চেয়ে শাশুড়ীর দরদ বেশী।"

কথাটা এমন কিছু ধারালো নয়। তবু আমার মনের ভিতরে কী যেন কেটে গেল। শাশুড়ী! মাসিমা হবেন টোগোর মতো একটা যে সে লোকের শাশুড়ী। মালা পড়বে মুক্তোর মালার মতো বাঁদরের গলায়।

আমার ভাব দেখে নীলি হেসে আকুল। "কী, দাদা? তোমার মুখখানা কালো হয়ে গেল কেন? তোমার তো খুশি হওয়া উচিত যে এত কাল পরে মালা বোনটির বিয়ের ফুল ফুটল। বোনের সুখ তোমার সহ্য হচ্ছে না?"

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, "টোগো যদি মালার যোগ্য বর হতো আমি এই মুহূর্তেই ওর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করতুম।"

নীলি খিল খিল করে হাসল। "যোগ্য বর হলে তুমি আরো ব্যথা পেতে, দাদা। আমার কাছে লুকিয়ে কী হবে? তুমি ধরা পড়ে গেছ।"

সত্যি কি তাই? আমি অবাক হয়ে ভাবি। নীলি হাসতেই থাকে।

আমার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "নীলি, বিয়ে করবি?"

"কাকে?" সন্ত্রস্ত হলো নীলি।

"টোগোকে।" রুদ্ধশ্বাসে বললুম আমি।

"যাও!" নীলি এমন স্বরে বলল যেন টোগো একটা

মানুষই নয়। তার হাসি থামল। পরে একটু পরিষ্কার করে বলল, "বন্ধুর বর চুরি করা অন্যায়।"

সঙ্কোচের সঙ্গে জানতে চাইলুম মালা কি মাসিমার নির্বন্ধে রাজী ?

নীলি বলল, "না। সে তার রাজপুত্র ভিন্ন আর কারো বধূ হবে না।"

ধন্যবাদ। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারিনে। মাসিমা হয়তো মালাকে বাধ্য করবেন। মেসোমশায় হয়তো হিমালয়ে যাবার জন্যে রাতারাতি দায়মুক্ত হতে চাইবেন। মালা বেচারি কার ভরসায় বেঁকে বসবে ? কাল্পনিক এক রাজপুত্রের ভরসায় ?

খুব একটা গর্হিত কাজ করতে হলো আমাকে। টোগোর সঙ্গে নীলির বিয়ের সম্বন্ধ। নীলিকে টোগো আগেই দেখেছিল, মোটরে করে পৌঁছে দিয়েছিল। তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল। একদিন টোগোকে আমাদের বাসায় নেমন্তন্ন করে মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম। প্রস্তাবটা মা'র মুখ দিয়েই করা হলো। নীলি ও আমি তখন আড়ালে। থতমত খেয়ে টোগো সময় নিল ভাবতে। ভেবে বলল, "আচ্ছা।"

মাসিমার মনে যাই থাক তিনি টোগোর কাছে কোনো দিন প্রকাশ করেননি যে তাকে তিনি জামাই করতে ইচ্ছুক। সুতরাং টোগোর দিক থেকে অপরাধ কিছু হয়নি। কিংবা আমার দিক থেকে। মাসিমা আমাদের দোষ ধরতে পারেন না। ভিতরে ভিতরে আঘাত পেলেন ঠিকই। বাইরে আনন্দ

দেখালেন। নীলিকে সোনার সিঁথিমৌর গড়িয়ে উপহার দিলেন।

এর পর শুরু হলো টোগোর নিন্দাবাদ। পড়াশুনায় ভালো নয়। বিলেত থেকে যে ডিগ্রী এনেছে তার বাজারদর নেই। ও-রকম ছেলের যুদ্ধে নাম দেওয়াই ভালো। জাপানীরা তো বর্মা দখল করে ফেলেছে। আর ক'দিন পরে চাটগাঁয় ঢুকবে। তখন তাদের রুখবে কে? এটা কি বৌ নিয়ে সুখে ঘর করার সময়?

টোগো যুদ্ধে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছিল। মাসিমার কটূ কথা তাকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিল। নৌবহরের উপর বরাবর তার একটা ঝোঁক ছিল। যাদৃশী ভাবনা তাদৃশী সিদ্ধি। নেভীতে একটা কমিশন জুটে গেল। তখন তাকে পায় কে! নীলিকে বলল, "এই বার আমি অ্যাডমিরাল টোগো না হয়ে ছাড়ছিনে!"

তা শুনে মাসিমার মুখ শুকিয়ে গেল। অ্যাডমিরাল না হোক কমোডোর কি ক্যাপটেন তো হবে। সমাজে কত সম্মান! তবে প্রাণে বাঁচলে হয়!

আমার মা'রও অবিকল একই চিন্তা। নীলি কিন্তু নির্ভয়ে তার স্বামীকে যুদ্ধের জন্যে স্বহস্তে সাজিয়ে দিল। বলল, "তুমি বীরপুরুষ। আমি ধন্য হয়েছি।"

আমিও টোগোর প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলুম। এত দিন ও নিজের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করছিল, তার কারণ প্রকৃত সুযোগ পায়নি, প্রকৃত সঙ্গিনী পায়নি। দেখতে দেখতে

লোকটার চেহারা বদলে গেল। সে আর মাসিমার মেজর ডোমো বা টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার কলামনিস্ট নয়। সে একজন যোদ্ধা, একজন দেশরক্ষী।

এর পর থেকে মাসিমার মুখে আমি তার প্রশংসা ভিন্ন আর কিছু শুনিনি। কিন্তু নীলিকে কিংবা আমাকে তিনি ক্ষমা করেননি। যদিও ব্যবহারে সেটা বুঝতে দেননি। নীলি একদিন মালাকে সব কথা খুলে বলেছিল। তা শুনে মালা তার গলা জড়িয়ে ধরে চোখের জল ঝরিয়েছিল। "কী বাঁচন বাঁচিয়েছিস আমাকে তোরা দু'জনে।" এই বলে সে নীলিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল।

দেখলুম আমার প্রতিও সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তার বেশী না। আমি তো রূপকথার রাজপুত্র নই। সে-রকম কোনো অভিমানও আমার ছিল না। আমি যা আমি তাই। নিতান্তই একজন আর্টিস্ট। জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত। সেই আমার রাক্ষসের সঙ্গে রণ। অসুন্দরের সঙ্গে রণ। শিল্পীর জীবনসংগ্রাম নিছক জীবিকার জন্যে নয়, সৌন্দর্যের স্বীকৃতির জন্যে। আমি যা সৃষ্টি করে যাচ্ছি তার ভিতরে যদি সৌন্দর্যের স্বীকৃতি থাকে তবে তার বাইরেও সেই সৌন্দর্যের স্বীকৃতি থাকবে। থাকতেই হবে। সেই অনুপাতে অসুন্দরের অধিকার খর্ব হবে। অসুন্দরের পরাজয় হবে। এ বিশ্বাস যদি হারিয়ে ফেলি তবে আমারি পরাজয়। লক্ষ টাকার মালিক হলেও।

সিঙ্গাপুরের পতনের পর থেকে কলকাতার লোকের মনে

ভয় ঢুকেছিল। রেঙ্গুনের পতনের পর সে ভয় বেড়ে গেল। যে কোনো দিন কলকাতায় বোমা পড়বে। যে কোনো দিন বাংলাদেশে জাপানীরা প্রবেশ করবে। স্থলপথে পৌঁছতে কিছু সময় লাগতে পারে, কিন্তু জলপথে সাত দিনও লাগে না। বুদ্ধিমানরা ইতিমধ্যেই পালাতে শুরু করেছিলেন। কলকাতার বাইরে তো নিশ্চয়ই, বাংলাদেশের বাইরেও। যার দৌড় যত দূর তার নিরাপত্তা তত দূর। যেখানে যত পোড়ো বাড়ী ছিল সব ভরে গেল।

মেসোমশায় টলবার পাত্র নন, কিন্তু মাসিমার আত্মীয়-স্বজনদের টনক নড়েছিল, তাই দেখে মাসিমারও। তাঁদের কেউ দেওঘরে, কেউ শিমুলতলায়, কেউ বেনারসে, কেউ দেরাদুনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন মাসিমাও নানান জায়গায় বাড়ী খুঁজতে লাগলেন। ঠিক এমনি সময় মেসোমশায় একখানা চিঠি পেলেন এলাহাবাদ থেকে। তাঁর বন্ধুরা তার জন্যে চাকরি জোগাড় করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ। নেবেন কি নেবেন না? তিনি ইতস্তত করছিলেন। মাসিমা তাঁর হাত ধরে টেলিগ্রামের ফর্ম সই করালেন। তিনি নিলেন।

মালার মনে আতঙ্ক ছিল না। কিন্তু সেও কলকাতা ছাড়তে পারলে বাঁচে। এখানকার সমাজে সে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছিল না। আর নিষ্প্রদীপ তার মনের উপর ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়েছিল। এয়ার রেড কবে হবে কে জানে? তার

জন্যে এখন থেকেই গর্ত খুঁড়ে সাইরেনের আওয়াজ শুনবামাত্র গর্তে ঢোকায় তার ঘোর আপত্তি। ওর চেয়ে বোমা খেয়ে মরা অনেক সহজ। তা বলে সে কলকাতা থেকে পালাতে চায়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষকে পিছনে ফেলে পালানো মানে তো মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে যাওয়া, শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে যাওয়া। কী লজ্জা! কী অন্যায়! তারা পালাবে কোথায়? তাদের যে জীবিকা এখানে।

তবু মালাকেও চলে যেতে হলো তার মা বাবার সঙ্গে। না গিয়ে উপায় ছিল না। কারণ মাসিমা কী জানি কার পরামর্শে বাড়ীখানা জলের দরে বেচে দিয়েছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে জাপানীরা যখন রেঙ্গুন দখল করতে পেরেছে তখন কলকাতা দখল না করে ছাড়বে না। নেহাৎ যদি তা না পারে তবে ধ্বংস করে দেবে। এমনও হতে পারে যে ইংরেজই পোড়ামাটি করবে, যাতে জাপানীর হাতে না পড়ে।

মেসোমশায় ইচ্ছা করলে বাড়ী বিক্রী বন্ধ করতে পারতেন। কিন্তু তা হলে বাড়ীর জন্যে তাঁর পিছুটান থাকত। হয়তো বাড়ীর টানে তাঁর পা উঠত না। অন্যের চোখে যা পলায়ন তাঁর চোখে তা অচল অবস্থা থেকে উদ্ধার। কলকাতায় তিনি যা আশা করে এসেছিলেন তা পাননি। তাঁর নিজের জীবনের পুনরারম্ভ। আর মাসিমাও কি পেলেন যা প্রত্যাশা করেছিলেন? মেয়ের ভালো বিয়ে? দেখতে দেখতে বছর পাঁচেক কেটে গেল। অচল অবস্থা সচল হবার

লক্ষণ নেই। তা হলে আজ এখনি মনঃস্থির করতে হয়। যুদ্ধ যদি কলকাতার দিকে এগিয়ে না আসত তা হলে মনঃস্থির করতে আরো সময় লাগত। হয়তো কোনো দিন মনঃস্থির করার মতো মনের জোর খুঁজে পাওয়া যেত না।

যুদ্ধকে তা হলে ধন্যবাদ দিতে হয়। তার দ্বারা অন্তত এইটুকু হয়েছে যে মাসিমার কলকাতা থেকে মন উঠে গেছে। আগে প্রাণ, তার পরে ধনসম্পদ। বেঁচে থাকলে আবার বাড়ী হবে। যদিও কেমন করে হবে তা তিনি জানেন না। পঁচিশ বছরের অর্ধেক সঞ্চয় তো বাড়ীর পিছনে গেল। দাম যা পাওয়া গেল তা সুদের চেয়েও কম। মাসিমা কী করবেন! অদৃষ্ট! তবু তো তাঁর ভাগ্য ভালো যে পাঁচ বছর আগে বর্মা থেকে চলে আসতে পেরেছেন। নইলে জাপানীদের আক্রমণের মুখে ঘরসংসার ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিতে হতো। তখন কোথায় দাঁড়াতেন! তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধব সময়মতো চম্পট দিতে না পেরে জাপানীদের খপ্পরে পড়েছে। মা গো! গা শিউরে ওঠে।

মাসিমা কাঁদতে কাঁদতে ট্রেনে উঠলেন। মেসোমশায় গম্ভীর বদনে। মালা শান্ত চিত্তে। এঁদের সঙ্গে আমার জীবন এমন ভাবে জড়িয়ে গেছল যে এঁদের ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে আমারও মন কেমন করছিল। বললুম, "মাসিমা, জাপানীদের আক্রমণের মুখে আমাকে ফেলে যাচ্ছেন। আপনি বড় নিষ্ঠুর।"

মাসিমা অভিভূত হয়ে বললেন, "তা হলে তুমিও চল।"

আমি কৃতার্থ হয়ে বললুম, "না, মাসিমা। স্পেনে কেন যাইনি তার জন্যে এখনো জবাবদিহি করে মরছি। কলকাতা কেন ছাড়লুম তার জন্যে জবাবদিহি অসম্ভব। আমাকে থাকতেই হবে। এর শেষ কোথায় তা দেখতেই হবে। অন্যের পক্ষে যা দুর্যোগ শিল্পীর পক্ষে তাই সুযোগ। কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকলে সঞ্জয় দেখত কী আর দেখে বলত কী? মহাভারত লেখা হতো কী নিয়ে? এবার কৌরবকে নয়, জাপানকে রুখতে হবে।"

মাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম তাঁর ইচ্ছায় দেশের বাড়ীতে। নীলি তার বিয়ের পর থেকে বাগবাজারে তার শ্বশুরবাড়ীতে থাকে। টোগোর আত্মীয়রা কেউ সরতে চান না। এর মধ্যেই দু' দু' বার কলকাতার বাইরে লটবহর নিয়ে ঘুরে আসা হয়েছে। বলেন, রামে মারলেও মরেছি, রাবণে মারলেও মরেছি। আমরা তো মরেই রয়েছি। তা হলে খামকা কলের জল ফেলে কুয়োর জল খেয়ে কলেরায় মরি কেন? জাপানী বোমার চেয়ে আমাদের দেশী মশা কম কিসে? না, বাপু, আর আমরা নড়ছিনে।

মেসোমশায় ট্রেন ছাড়ার সময় বললেন, "দেখ, দেবপ্রিয়, যার যেখানে কাজ তার সেখানে স্থিতি। কলকাতায় আমার কাজ বলতে কিছু ছিল না। মালার বিয়ের চেষ্টার জন্যেই সেখানে থাকা। তা তো হবার নয়। যেখানে আমার কাজ সেখানে আমি যাচ্ছি। যুদ্ধের থেকে পালিয়ে যাচ্ছিনে। তফাৎ আছে। মনে রেখো।"

আমার মন মানল না। ওটা একপ্রকার পলায়নই। স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দিতে যাইনি বলে আমার বিবেক আমাকে খোঁটা দিত। ফাসিস্টদের জিততে দিয়েছি, তাই তারা এখন দাবানলের মতো দুনিয়ার দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। ভারতেও ছড়াতে কতক্ষণ ? এবার আর দূর থেকে দেখা নয়, দূরে পালিয়ে গিয়ে দাবানলের গ্রাস থেকে বাঁচা নয়, এবার তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। যুঝতে হবে। সমস্ত শক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ করতে হবে। গতিরোধ করতে হবে। আমি শিল্পী। আমার হাতে হাতিয়ার নেই। তুলিকেও আমি হাতিয়ার করতে নারাজ। কিন্তু এক শ' রকম উপায়ে আমি অন্যায়কে বাধা দিতে পারি। ন্যায়কে জোর দিতে পারি।

কিন্তু এইখানেই খটকা বাধল। ন্যায়কে জোর দিতে যাব যে, ন্যায় কি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের দিকে ? আগে তো ওরা সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করুক। করেছে তার প্রমাণ দিক। নয়তো সাম্রাজ্যবাদকেই জিতিয়ে দেওয়া হবে। কেমন করে বলব যে, সেটা ফাসিবাদের চেয়ে ভালো ? হয়তো এক পোঁচ কম কালো। কিন্তু কালো বইকি। ক্রিপস্ মিশন ফিরে যাবার পরে দেশের লোককে বোঝানো শক্ত হলো যে, কম কালোর পক্ষেই ন্যায়, বেশী কালোর পক্ষে অন্যায়, সুতরাং কম কালোর পক্ষে খাড়া হতে হবে।

অথচ নিরপেক্ষ থাকাও লজ্জাকর। কেবল লজ্জাকর নয়, অপরাধজনক। জাপানীরা ধ্বংস করতে করতে ভারতের বুকের

উপর দিয়ে এগিয়ে আসবে, ইংরেজরা ধ্বংস করতে করতে ভারতের বুকের উপর দিয়ে পিছু হটবে, ভারতের লোক উলুখড়ের মতো তু'পক্ষের মার খেয়ে মরবে। কে এ দৃশ্য দেখে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে! করতে একটা কিছু হবেই। সম্ভব হলে অহিংসভাবে। না করলে অপরাধ হবে। দেশের কাছে, জনগণের কাছে। করলে আবার কথা উঠবে যে ফাসিস্টদের সহায়তা করা হচ্ছে। ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। তার আগে তুনিয়া জুড়ে বদনাম দেওয়া হবে। হিংস্র বলে বদনাম। বিভীষণ বলে বদনাম। আমরা তা হলে মুখ দেখাব কী করে? কালো মুখ নিয়ে ফাঁসীকাঠে ঝুলব? তা ছাড়া এমনও তো হতে পারে যে, ফাসিস্টরা তার সুযোগ নিয়ে জিতবে। আর সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সঙ্গে ফাসিবাদবিরোধীদেরও হার হবে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মেসোমশায়কে চিঠি লিখি। তিনি উত্তর দেন, "জাতিহিসাবে স্বাধীনতা কবে পাব জানিনে, কিন্তু স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত আজ এখনি নিতে পারি। নেওয়া উচিতও। সিদ্ধান্তটা আমাদের হাতে। ফলাফল ইতিহাসের হাতে। এমন লগ্ন বহু শতাব্দীতে একবার আসে। আজকের এই লগ্নে গান্ধীজীই বর। আর সকলে বরযাত্র। আমিও তাঁর পিছনে। যদিও আমাকে আমার পেনসন বাঁচিয়ে চলতে হবে।"

চিঠিখানা আমি ছিঁড়ে ফেলি।

গান্ধীজী তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে চার দিকে সাড়া পড়ে যায়। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "যে কোনো লোক

একটা সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাতে পারে। কিন্তু আমি চাই জনগণকে জাগাতে।" তাই ঘটল। জনগণ জাগল। ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব সেই জাগরণ। জগতের ইতিহাসেও তার তুলনা নেই। যুদ্ধের মাঝখানে কে কবে সাহস পেয়েছে যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তিকে জাগাবে? পরে বোঝা গেল আসলে ওটা যুদ্ধবিরোধী উদ্যোগ। যুদ্ধের গতিরোধই তার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ভারতের মাটিতে যুদ্ধবিগ্রহ হলো না।

জাপানীরা এলো না। কিন্তু আমার মতো একচক্ষু হরিণদের অবাক করে দিয়ে কোথা থেকে এসে হাজির হলো মন্বন্তর। বাংলাদেশে পঁয়ত্রিশ লাখ মানুষ মারা গেল মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষে। যুদ্ধে কি এত লোক মরত! লজ্জায় ক্রোধে গ্লানিতে আমার পেয়ালা ভরে গেল। যুদ্ধের দৃশ্য বিপ্লবের দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায় ও আঁকা যায় কিন্তু দুর্ভিক্ষের দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখাও পাপ। এমন নৈতিক সঙ্কটে কখনো আমি পড়িনি। আমি যে খেয়ে দেয়ে বেঁচে আছি এটা তো শুধু আরেকজন বা আরো কয়েকজন না খেতে পেয়ে মারা গেছে বলেই। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ভূত প্রেত পিশাচ আঁকি। জানতে চেয়ো না পিশাচ কারা। প্রদর্শনীতে ছবি দিই। দর্শকরা বলেন, ঠিক যেন পাগলের প্রলাপচিত্র। অনুভব করি শিল্পকে পাগলের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। যে পালায় সেই বাঁচায়।

অগাস্ট মাসের বিক্ষোভ বা বিপ্লবের পর লক্ষ করি আমার নিজের অভ্যন্তরেও একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। আমি আমার

স্বকালের হতে গিয়ে স্বদেশের হতে ভুলেছিলুম। এখন উপলব্ধি করলুম যে ভারতের অনাদি অনন্ত শিল্পীপরম্পরা থেকে বিযুক্ত হলে আমি কেউ নই। আমি না ঘরকা না ঘাটকা। ভারতের ইতিহাসের স্রোত যেদিকে আমার সৃষ্টির স্রোতও সেই দিকে। সুতরাং পলায়নের সংকল্প যখন নিলুম তখন তার নাম দিলুম ভারতের শিল্পীপরম্পরার অন্বেষণ।

এলাহাবাদ আমার পথে পড়ে। বিছানাপত্তর স্টেশনে রেখে টাঙ্গায় চেপে বসলুম।

পাঁচ

জানতুম সেই বিয়ের ব্যাপারের পর থেকে মাসিমা আমার উপর অপ্রসন্ন। কিন্তু অবাক হয়ে আবিষ্কার করলুম যে, প্রয়াগে কেবল গঙ্গাযমুনা নয়, অন্তঃসলিলা ফল্গুও প্রবহমান। মাসিমা আমার ওজর আপত্তি কানে তুললেন না। স্টেশনে লোক পাঠিয়ে মালপত্তর আনিয়ে নিলেন।

মাসিমারও পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি ও তাঁর মতো কয়েকজন মহিলা মিলে একটি মণ্ডলী করেছেন। তাঁদের কাজ হলো রাজবন্দীদের পরিবারের তত্ত্ব নেওয়া, নির্যাতিতদের জন্যে চাঁদা তোলা, উৎপীড়িতদের আদালতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। এর দরুন তাঁদের সরকারী মহলের বিষ নজরে পড়তে হয়েছে। মাসিমা নিমন্ত্রণ করলে কেউ তাঁর বাড়ীতে আসেন না, আসতে সাহস পান না। পাছে রিপোর্ট যায় যে রাজদ্রোহী। তাঁকে বা মেসোমশায়কেও কোথাও নিমন্ত্রণ করা হয় না। ব্যতিক্রম কেবল অধ্যাপক মহল।

"অন্যায় তো আমরা কিছু করিনি বা করছিনে। মানুষের প্রতি মানুষের যেটুকু কর্তব্য শুধু সেইটুকুই করতে চেষ্টা করছি। তার দরুন যদি কষ্ট পেতে হয় পাব। কিন্তু রাঙা চোখ দেখে পেছিয়ে যাব না।" কালো মানুষের রাঙা চোখ দেখলে হাসিও

পায় আমার। ছি ছি! বিদেশীর কাছে এমন করে দাসখৎ লিখে দিতে আছে!" মাসিমা ধিক্কার দেন।

"তা হলেও, মাসিমা, একটু সাবধান হওয়া ভালো। মেসোমশায়ের পেনসন—" কথাটা আমি শেষ করবার আগেই মাসিমা কেড়ে নেন।

"সেইখানেই তো বাধছে। নইলে আমিও প্রমাণ করে দিতুম ভারতের বীরাঙ্গনারা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। জানো, দেবপ্রিয়, ওরা গ্রামকে গ্রাম ঘেরাও করে লোকগুলোকে পশুর মতো গুলী করে মেরেছে। ওঃ! আমরা অসহায়। আমরা দেশশুদ্ধ লোক অসহায়। জবাহরকে যে কোথায় চালান দিয়েছে কেউ বলতে পারছে না। শুনছি নাকি দক্ষিণ আফ্রিকায়। বেঁচে আছে কি না কে জানে! হাঁ, ওরা সব পারে। যেমন তোমার জাপানী তেমনি তোমার ইংরেজ।"

আমি যে পাগল হবার ভয়ে পালিয়ে এসেছি সে কি এইসব শুনতে? তা হলে তো আবার পাগল হতে হয়। গান্ধীজী অসহায় বলেই তিন সপ্তাহ অনশন করে জগতের দরবারে তাঁর আক্ষেপ জানালেন। আমিও অসহায়। কিন্তু আমার তো অনশন করার ক্ষমতা নেই। দিন তিনেক চালিয়েছিলুম। তার পর থেকে সে ভার যোগ্যতরদের উপর অর্পণ করেছি।

মেসোমশায়ের ঘরে গিয়ে দেখি তিনি আপন কাজে তন্ময়। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো স্থির। ধ্যানীবুদ্ধের মতো আত্মদীপ। তাঁর ভাস্বর মুখমণ্ডল ঘিরে অদৃশ্য একটি আভামণ্ডল।

আমি তাঁর তপোভঙ্গ করিনে। এক কোণে আসন নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। পকেট থেকে কাগজ পেনসিল বার করে আঁকি।

"এই যে, নির্মল, কখন এলে?" মেসোমশায় আমাকে প্রথমটা চিনতে পারলেন না। তার পর বললেন, "ও! দেবপ্রিয়! কখন থেকে বসে আছো? আমি ভাবছি নির্মল। আমার ইনস্টিটিউটের সহকারী। আসবে একটু পরে। আলাপ করে খুশি হবে।"

"আপনার জীবনের পুনরারম্ভ দেখে আরো খুশি হচ্ছি, মেসোমশায়।" বললুম তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে।

যে ফসল ফলাতে ছ'মাস লাগে তাকে তিন মাসে ফলানো যায় কি না এই নিয়ে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা। তা যদি সম্ভব হয় তবে বছরে চার বার ফসল ফলবে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের পেট ভরবে। তিনি বললেন, "এই তোমার মন্বন্তরের ধন্বন্তরি।"

"মেসোমশায়," আমি বললুম, "এই তা হলে আপনার প্রশান্তির সীক্রেট! আমি যে এদিকে পাগল হয়ে গেলুম চার দিকে অনাসৃষ্টি দেখে দেখে।"

তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন, "অনাসৃষ্টির উত্তর সৃষ্টি। যেমন অনাবৃষ্টির উত্তর বৃষ্টি। ওরা যেমন তোমাকে পাগল করে দিচ্ছে তুমিও তেমনি ওদের সুস্থ করে দেবে। কার জোর বেশী? ওদের না তোমার?

পাপের না পুণ্যের ? কুশ্রীতার না সৌন্দর্যের ? ওরা যদি চলে ডালে ডালে তো তুমি চলবে পাতায় পাতায়। অন্যায়ের উপর ন্যায় একদিন জয়ী হবেই। অসত্যের উপর সত্য। কিন্তু পালিয়ে আসা তো কোনো সমাধান নয়। ওদের আওতা থেকে তুমি যেমন বাঁচলে তেমনি তোমার আওতা থেকে ওরাও তো বঞ্চিত হলো। সেটা কি ওদের পক্ষে ভালো হলো ?"

আমি গলে গেলুম। বললুম, "আমার যদি জানা থাকত প্রশান্তির সীক্রেট !"

"ওহে দেবপ্রিয়," তিনি বললেন কারুণ্যের সঙ্গে, "যা দেখছ তা নয় আমার মতো অশান্ত আর কে ? দেশ আমার পরাধীন। স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছে। আমি যোগ দিতে পারছি কই ? রেড ক্রসের কাজ করছেন আমার গৃহিণী। সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। তার বেশী কী আর করতে পারি দেশকে স্বাধীন করতে ? ভিতরে ভিতরে জ্বলছি। গান্ধী তাঁর সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেবার সময় চমৎকার একটি কথা বলেছিলেন। চার দিকে যখন আগুন জ্বলছে তখন আগুনে ঝাঁপ দিয়েই শীতলতা। আমি তাঁর উক্তির নীর বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু নিয়েছি। রাজনৈতিক কর্মপন্থা ছেড়ে নৈতিক ধর্মপন্থা। আগুন জ্বলছে। আমিও জ্বলছি। প্রাণ আমার শীতল। আঃ কী ঠাণ্ডা !"

তিনি যে জ্বলছেন তার আঁচ আমার অঙ্গেও লাগছিল।

নিবাত নিষ্কম্প যে দীপশিখা সেও তো জ্বলতে জ্বলতেই নিবাত নিষ্কম্প।'

মেসোমশায় বলতে লাগলেন, "তোমার মাসিমাকে বলি, আজকের পৃথিবীতে তুমি সুখ দেখছ কোথায়? সুখ চাইলেই কি সুখ মেলে? সুখ পেলেও কি সুখ ভোগ করতে লজ্জা করবে না? যেখানে এত দুঃখ। এত অসুখ। মালাকে বলি, এমন কিছু কর যাতে মানুষ বাঁচে, যাতে মানুষ সুখী হয়, তা হলে তুইও বাঁচবি, তুইও সুখী হবি। যে বাঁচায় সেই বাঁচে। যে সুখী করে সেই সুখী হয়। তোমাকেও বলি, পালিয়ে তুমি যাবে কোন স্বর্গে! সর্বত্র এই একই মৃত্যু, একই অসুখ। নাম রূপ ভিন্ন। ইউরোপে জন্মালে কি তুমি এতদিন বেঁচে থাকতে? থাকলে হয়তো এতদিনে যুদ্ধক্ষেত্রে কি বন্দিশালায় কি পাগলাগারদে। স্বাধীনতা নেই বলে আমরা অশান্ত। কিন্তু স্বাধীনতা থেকেও তো ওরাও অশান্ত। তা হলে মানুষ কী চায়? কী পেলে মানুষ শান্ত হবে?"

আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। কোনো দিন এ নিয়ে চিন্তা করিনি। প্রতিধ্বনি করলুম, "কী পেলে মানুষ শান্ত হবে?"

মেসোমশায় ভাবাকুল স্বরে বললেন, "এক এক বয়সে এক এক উত্তর দিয়েছি। এই তো কিছুদিন আগে বলতুম, ঈশ্বরকে। এখন মনে হচ্ছে ঈশ্বরকে পেলেও মানুষ শান্ত হবে না। তা হলে কি ঐশ্বর্যকে পেলে শান্ত হবে? তাই যদি হতো তবে বুদ্ধ কেন

গৃহত্যাগ করতেন ? সেন্ট ফ্রান্সিসও তো বড়লোকের ছেলে। না, এটা একটা উত্তরই নয়। যম নচিকেতার কাছে এই প্রস্তাবই করেছিলেন। নচিকেতা প্রত্যাখ্যান করেন। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। আছে আর কোনো উত্তর। যা পেলে এক নিমেষেই এ লড়াই থেমে যেত।"

একটিমাত্র উত্তর আমার মনে আসছিল। মানুষ চায় মানুষেরই প্রেম। জগতে যা সব চেয়ে দুর্লভ। রাশিয়ানদের প্রেম পেলে জার্মানরা নিরস্ত্র হতো, জার্মানদের প্রেম পেলে রাশিয়ানরা নিরস্ত্র হতো। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে রাশিয়ান জার্মানকে ও জার্মান রাশিয়ানকে ভালোবাসলেও জাতিগতভাবে ভালোবাসতে শেখেনি। বরং আরো ঘৃণা করতে শিখছে। জাতিবৈর দিনকের দিন আরো গভীর আরো নিবিড় হচ্ছে। যুদ্ধে হারজিত অনিশ্চিত, কিন্তু জাতিবৈর সুনিশ্চিত। একালে একজন মহাপুরুষকেই জাতিগতভাবে ভালোবাসার শিক্ষা দিতে দেখি। একটিমাত্র দেশেই। কিন্তু বুকে হাত রেখে বলতে পারিনে যে গান্ধীর শিক্ষা আমরা গ্রহণ করেছি। অহিংসার উপর আস্থা আগে যেটুকু ছিল এখন সেটুকুও নেই।

আমাব মুখে এসব কথা শুনে মেসোমশায় বললেন, "গান্ধীকেই সাক্ষ্য দিয়ে যেতে হবে। ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। প্রেম ব্যক্তিগত থেকে জাতিগত হবে যদি প্রথমে একজনের অন্তরে জয়ী হয়। গান্ধী তো হেরে যাননি। না গেছেন ?"

আমি আবেগময় কণ্ঠে বললুম, "না। তিনি হেরে যাননি। নইলে একুশ দিনের অগ্নিপরীক্ষায় মারা যেতেন। মহাত্মা গান্ধীকী জয়।"

"তুমি আমার জীবনের পুনরারম্ভ দেখছ বলছিলে," মেসোমশায় অন্য প্রসঙ্গে গেলেন, "পুনরারম্ভ অত সহজ নয়। কাজটা মনের মতো, স্থানটা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম প্রাণকেন্দ্রের অন্যতম, স্মৃতি তিন হাজার বছর পেছিয়ে যেতে কোথাও ছেদ পায় না, ভারতের প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে অসংখ্য নরনারী আসে ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করতে—যেমন আসত তিন হাজার বছর আগে, যেমন এসেছে তিন হাজার বছর ধরে। ভারতীয় সভ্যতার মূলস্রোতে অবগাহনের আনন্দ আমারও প্রতি অঙ্গে। তা হলেও পুনরারম্ভ এ নয়। আমি চাই এমন এক সরোবরে স্নান করতে যা আমাকে নূতন করে দেবে, তরুণ করে দেবে। সামনে যে আরো তিন হাজার বছর রয়েছে। স্বপ্ন দেখতে হবে যে।" বলতে বলতে তাঁর নয়নে স্বপ্ন নেমে এলো ভাবী ভারতের।

তাঁর দিকে চেয়ে মনে হলো আমিই তাঁর তুলনায় বৃদ্ধ। কারণ আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। আমি তো সামনের ত্রিশ বছরের বেশী দেখতে পাইনে। তার সমস্তটা জুড়ে এই শতাব্দীর অভিনব থার্টি ইয়ার্স ওয়ার। এ যুদ্ধ কি ত্রিশ বছরের আগে থামবে? থামলেও ধোঁয়াতে থাকবে তার আগুন। আবার একদিন জ্বলে উঠবে। যতদূর দৃষ্টি যায় আমি শুধু দেখতে পাই অনর্থ আর

অনাসৃষ্টি, পচন আর ভাঙন। আমি শুধু দেখতে পাই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয় আর অপচয়। স্বপ্ন দেখতেও আমি ভয় পাই। সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে স্বপ্ন দেখেছিল ইউরোপের মানুষ। তার পরিণাম হলো সারা বিংশ শতাব্দী ধরে সংগ্রাম আর সংঘাত আর বিপ্লব আর ধ্বংস।

মেসোমশায় তা শুনে বললেন, "তোমার সব কথা মেনে নিলেও এই হচ্ছে ছবি আঁকবার স্বপ্ন দেখবার ধ্যান করবার সময়। বীজ বুনতে হলে বুনতে হয় এই দুর্দিনেই। একটা যুগের বা একটা শ্রেণীর পতনকেই তুমি মানবসভ্যতার বা ভারতসভ্যতার পতন বলে হাল ছেড়ে দিয়ো না। যেখানে সভ্যতার যথার্থ ভিৎ সেখানে ঝড়ের দাপট পৌঁছয় না। সত্য বা সৌন্দর্য বা প্রেম তার দ্বারা একটুও টলে না। আমি থাকব সত্য নিয়ে, তুমি থাকবে সৌন্দর্য নিয়ে, গান্ধী থাকবেন প্রেম নিয়ে। কে আমাদের কী করতে পারবে? সাধককে মৃত্যুও সাহায্য করে।"

মালারও পরিবর্তন হয়েছিল। এই এক বছরে সে অনেক-খানি বেড়েছে। ছিল বালিকা। হয়েছে নারী। তার মনের নাগাল পাওয়া ভার। কেবল আমার পক্ষে নয়, তার জননীর পক্ষেও। তিনি একদিন আমাকে বলছিলেন যে তাঁর মেয়ে তাঁর কাছে মন খোলে না। মেয়ের মন জানতে হলে যেতে হয় তার সখীদের দ্বারে। সখীদের মধ্যে সব চেয়ে প্রিয় মনোরমা কওল। কাশ্মীরী। একদিন সেই মনোরমার

সঙ্গেও আমার আলাপ হয়ে গেল। ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। ফরওয়ার্ড মেয়ে। পরে সালোয়ার কামিজ ও চুন্নি। মালাও তাই ধরেছে। ঘোরে সাইকেলে চড়ে। তাও লেডিজ সাইকেল নয়। মালাও তাই করে। তবে ওর যেমন বব করা চুল মালার তেমন নয়। দেরি আছে।

মালাকে একদিন নিভৃতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা, মালা, এখনো কি তুমি বিশ্বাস কর যে এটা রূপকথার জগৎ ?"

মালা চমকে ওঠে। প্রশ্নটা তার প্রত্যাশাতীত। বলে, "কার কাছে শুনেছেন এ কথা ? নীলির কাছে ?" তার পর ধীরে ধীরে মন খোলে, "হাঁ, দেবুদা, এখনো আমি বিশ্বাস করি যে এটা রূপকথার জগৎ।"

"বল কী !" আমারও চমক লাগে। "এত বড় বিপর্যয়ের পরেও ! কলকাতার বাড়ীখানা নীলাম দরে বিকিয়ে গেল। এলাহাবাদে এসে আশ্রয় নিতে হলো। তবু তুমি বলবে এটা রূপকথার জগৎ ! তাই যদি হবে তো এই সব যুদ্ধ বিপ্লব মন্বন্তর এ জগতে কেন ?"

"রূপকথা পড়েননি ?" মালা বলে বিস্ময়ের সঙ্গে বিষাদ মিশিয়ে, "তাতেও দেখবেন রক্তের নদী হাড়ের পাহাড়। রাক্ষস রাক্ষসী। নিষ্ঠুর রাজা। ডাইনী রানী। নিরীহ শিশুর প্রাণনাশ। উঃ ! কী নেই তাতে !" মালা শিউরে ওঠে, তার পরে সামলে নিয়ে বলে, "তা সত্ত্বেও সেটা রূপকথার জগৎ। সে জগতে সুন্দর আছে। রাজপুত্র আছে। সে ঘর ছেড়ে

বেরিয়ে পড়ে আর বিভীষিকার সঙ্গে লড়াই করে। আর জেতে। আর অমনি সব ঠিক হয়ে যায়। সংসারে সুখ ফিরে আসে। মরেছে যারা তারাও বেঁচে ওঠে।"

এই সরল মিষ্টি মেয়েটিকে আমি কেমন করে বোঝাব যে সেই সব রক্তের নদী আর হাড়ের পাহাড় যদিও আছে, সেই সব রাক্ষস রাক্ষসী আছে যদিও, নিষ্ঠুর রাজা আর ডাইনী সওদাগর যদিও রয়েছে, তবু আজকের এ জগতে রাজপুত্র নেই, থাকলেও সে লড়াই করে না, লড়াই করলেও সে জেতে না, জিতলেও সব অমনি ঠিক হয়ে যায় না। লড়াই একটা বাধে বইকি। কিন্তু তার মধ্যে রাজপুত্র কোথায়? জয় একটা ঘটে বইকি। কিন্তু তার মধ্যে মহত্ত্ব কোথায়? শান্তি ফিরে আসে না, সুখ ফিরে আসে না। মরেছে যারা তারা মরে বেঁচেছে। বেঁচে ওঠার প্রস্তাব করলে তারা বলবে, "বাঁচিতে চাহি না আমি কুৎসিত ভুবনে।"

মালা তার ডাগর দুটি চোখ আকাশের দিকে তুলে আপন মনে বলে যায়, "আমার কেমন যেন বোধ হয় আমি কোনো এক রূপকথার ভিতর দিয়ে চলেছি। ঘটনাগুলো রূপকথার ঘটনার মতো লাগছে। যুদ্ধ আর বিদ্রোহ আর মন্বন্তর সব যেন রূপকথার ঘটনা। সুন্দর আর অসুন্দর আর সু আর কু সব যেন আমার চেনা চেনা ঠেকছে। মনে হচ্ছে এ কাহিনীটা আমার জানা। খুব একটা নতুন কিছু নয় যে উত্তেজিত হব।"

আমি আশ্চর্য হয়ে সুধাই, "কোন্ কাহিনী, বল তো ?"

মালা নিবিষ্টভাবে উত্তর দেয়, "অরুণ বরুণ কিরণমালা। কিরণের মতো আমিও চলেছি মায়াপাহাড়ের পথে। দুর্গম পথ। পাথরের পর পাথর। যত সব পথিক রাজপুত্র। পথে প্রাণ দিয়েছে। আনতে হবে মুক্তা ঝরার জল। সে জল ছিটিয়ে দিলে ওরা বাঁচবে। আনতে হবে সোনার শুকপাখী। সে পাখী ঘরে নিয়ে ওরা সুখী হবে। পারব কি আমি আনতে ? পারব কি ওদের বাঁচাতে ও সুখী করতে ? না ওদেরি মতো পাথর হয়ে যাব ?"

যা ভয় করেছিলুম তাই। ওর নাম যে কিরণমালা থেকে মালা। মনে ছিল না বলে জিজ্ঞাসা করি, "কেন ওরা পাথর হয়ে যায় ? ওই সব পথিক রাজপুত্র ?"

"জানেন না ?" মালা বলে তার সুন্দর চোখ দুটি আমার চোখে রেখে, "ওরা ভুলে যায় যে পিছন ফিরে তাকালেই পাথর হয়ে যাবে। যেই পিছন ফিরে তাকিয়েছে অমনি পাথর হয়ে গেছে।"

"কিন্তু কেন পিছন ফিরে তাকায় ?" আমার মনে পড়ে না বলে সুধাই।

"ওঃ ! আপনার মনে নেই বুঝি ?" কাহিনীটার খেই ধরিয়ে দেয় মালা। বলে, "ওরা জানত যে পিছন ফিরে তাকালেই পাথর হয়ে যেতে হবে। তবু ওরা কেউ বা ভয় পেয়ে কেউ বা প্রলোভনে ভুলে কেউ বা আর্তনাদ শুনে করুণায় গলে

গিয়ে পিছন ফিরে তাকায়। আর অমনি মায়াপাহাড় ওদের পরাস্ত করে।”

হাঁ। আমার মনে পড়ে। কিন্তু বুঝতে পারিনে আমি কী ওর তাৎপর্য। জানতে চাই। “তার পর, মালা? ওই যে সব রাজপুত্র ওরা কারা?”

“ওরা কারা?” মালা আমার প্রতিধ্বনি করে। “ওরা এই যুগের সাধারণ সৈনিক। ওদের মধ্যে অহিংসাবাদী সৈনিকরাও আছে। ওদের কার কী দেশ বা রাষ্ট্র, কার কী জাতি বা ধর্ম, কার কী মতবাদ বা আদর্শ সেসব আমার গণনা নয়। আমি দেখতে পাই সকলেই ওরা যে যার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। বেশীর ভাগই পথের মাঝখানে প্রাণ দিয়েছে বা দেবে। যুদ্ধশেষে ফিরবে যারা তারাই বা কী হাতে করে ফিরবে? সে ফেরাটা কি মুক্তা ঝরার জল আর সোনার শুকপাখী নিয়ে ফেরা? তা যদি না হয় তবে আবার তাদের যাত্রা করতে হয়। লড়াই করতে হয়। আবার প্রাণ দিতে হয় পথের মাঝখানে।”

আমি অবাক হই। মালাও তা হলে এত কথা ভাবে! ওই একরত্তি মেয়ে। ওর এত কথা মনে আসে! না, একরত্তি মেয়ে নয়। এখন কত বড় হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই পিতার তপোবনে বাধাহীন-ভাবে বেড়েছে। অরিজিনাল ভাবে মানুষ হয়েছে। শুধু বড় হয়েছে তা নয়। বড় হয়েছে।

সবাই তো আজকাল চুল চেরা বিশ্লেষণ করে। মানুষের

সঙ্গে মানুষের কোথায় অমিল, কেন অমিল। কারা ফাসিস্ট, কমিউনিস্ট কারা, কারা ইম্পিরিয়ালিস্ট বা ফিউডালিস্ট, কারা গান্ধীবাদী। মানুষে মানুষে মিল দেখছে কে? সে ওই মালা। ওর কাছে অমিলটা তুচ্ছ।

কিন্তু আমার কাছে তো নয়। আমি কেমন করে সায় দিই? আমি বলি, "মালা, মুক্তা ঝরার জল কিন্তু সকলের জন্যে নয়। তুমি যদি কিরণমালা হতে তা হলে হয়তো করুণা করে নাট্‌সীদেরও বাঁচাতে। তা হলে কী সর্বনাশ হতো বল দেখি!"

মালা বলে তন্ময়ভাবে, "মুক্তা ঝরার জল যদি সত্যি পাই তা হলে আমি কার্পণ্য করব না। বাছবিচার করব না। যতগুলো পাথর দেখব প্রত্যেকটার গায়ে ছিটিয়ে দেব। তা ছাড়া পাথরগুলো যদি পাশাপাশি পড়ে থাকে একটার গায়ে ছিটোনো জল আরেকটার গায়েও লাগবে। এড়ানো যাবে না। পাথরের রূপ দেখে চিনবই বা কী করে, কে নাট্‌সী কে নয়?"

এ যুক্তির উত্তর নেই। তবু আমি ভাবতেই পারিনে যে মুক্তা ঝরার জল সকলের জন্যে। মানবের শত্রু দানবের জন্যেও। বলি, "মালা, তুমি যাকে বাঁচাবে সে যদি আর পাঁচজনকে বাঁচতে না দেয়, সে যদি হয় কালসাপ, তা হলে তাকে বাঁচানো মানে তো আর পাঁচজনকে মারা। তখন তুমিই হবে তাঁদের মৃত্যুর নিমিত্ত। না, মালা, মুক্তা ঝরার জল

সকলের জন্যে নয়। আর সোনার শুকপাখী? সেও কি সকলের জন্যে? যারা আর-দশজনকে অসুখী করবার জন্যেই বাঁচে সেই সব ডাইনী সওদাগরদের হাতে সোনার শুকপাখী দিলে কি তারা পাখীটার ঘাড় মটকিয়ে সোনাটাকে মুনাফায় খাটাবে না? আর-দশজনকে অসুখী করবে না?"

মালা টলে না। বলে, "সে ভাবনা কিরণমালার নয়। সে ভাবনা ভাবলে মুক্তা ঝরার জল আনতে যাওয়া হয় না। গেলেও সে যাওয়া নিষ্ফল।"

"মালা," আমি তারই ভালোর জন্যে বলি, "শুনেছি কিরণমালা থেকে মালা তোমার নাম। তা বলে কিরণমালার মতো তুমি কেন যাত্রা করবে নিশ্চিত বিপদের হানা এলাকায়? কাজ কী তোমার মুক্তা ঝরার জল সোনার শুকপাখী আনতে গিয়ে?"

"ওসব তবে আনতে যাবে কে? অরুণ বরুণ তো নেই। আপনি?" মালা আমার দিকে তাকায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

"আমি!" আমি হকচকিয়ে যাই। আমি গেলে যদি মালার যাওয়া রদ হয় তা হলে আমি যেতে রাজী। কিন্তু আমি, যে স্বীকারই করিনে এটা রূপকথার জগৎ বা এখানে মুক্তা ঝরার জল সোনার শুকপাখী খুঁজলে মেলে। অবিশ্বাস নিয়ে যদি রওনা হই তবে অরুণ বরুণের মতো আর ফিরে আসব না। তখন মালাকেই বাহির হতে হবে।

"আমি!" আমি সামলে নিয়ে বলি, "না, মালা। আমি নয়।"

"তা হলে," মালা বলে মলিন মুখে, "কিরণকেই যেতে হয়। তার নিয়তি।"

আমি মেনে নিতে পারিনে। আবেগের সঙ্গে বলি, "এত বড় জগতে আর কেউ কি নেই? যার খুশি সে যাক। তুমি কেন যাবে? তোমার বয়সের তরুণীদের মতো তুমিও হাসবে খেলবে আমোদ আহ্লাদ করবে। ভালোবাসবে বিয়ে করবে সুখী হবে।"

"ওঃ! এই আপনার সুখের সূত্র!" মালা হেসে ওঠে। তার চোখে বিজলী ঝলক।

তার চোখে চোখ রেখে আমার চকিতে মনে হয় এ মেয়ে ভালোবাসা কাকে বলে জানে। এলাহাবাদে এসে মালার যে পরিবর্তন হয়েছে এই তার সঙ্কেত। মালা প্রেমে পড়েছে।

কেন জানিনে আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে পারলুম না। ভুলে গেলুম কী ওর জিজ্ঞাসা। এই তো একটু আগে ওকে বলছিলুম ভালোবাসতে বিয়ে করতে সুখী হতে। তাও গেলুম ভুলে। আমার অন্তর তখন উদ্বেল। মালা প্রেমে পড়েছে। কে জানে কে সেই ভাগ্যবান যার প্রেমে পড়েছে! সে কি নির্মল? না, জানতে চাইনে। জানতে আমার প্রবল অনিচ্ছা।

আকাশে রামধনু দেখলে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের হৃদয়টা নেচে উঠত। যেমন ছেলেবয়সে তেমনি যুবাবয়সে তেমনি বুড়োবয়সে। আমার হৃদয় নেচে ওঠে যখন শুনি কোনো মেয়ে বা কোনো ছেলে প্রেমে পড়েছে। সম্পূর্ণ অহেতুক আমার পুলক। যেমন

কিশোরকালে তেমনি প্রথমযৌবনে তেমনি মধ্যযৌবনে। আমার সঙ্গে যার শত্রুতা আছে এমন কোনো যুবক প্রেমে পড়েছে শুনলে আমি শত্রুতা ভুলে গিয়ে অকারণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হই। সে হয়তো খবরই রাখে না যে আমি আমার মনে মনে তার সুখ কামনা করছি। মনে মনে বলছি, সুখী হোক, সুখী হোক বিটকেলটা। রাসকেলটা সুখী হোক।

প্রেমের সঙ্গে সুখের কী সম্পর্ক? বৈষ্ণব কবি বলে গেছেন, "সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ আসে তার ঠাঁই।" তাঁর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করতুম, 'আচ্ছা, গোসাঁই ঠাকুর, দুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি কী আসে তার ঠাঁই?" তিনি বোধহয় ফাঁপরে পড়ে বলতেন, "সুখ।" তা হলে সুখী হবার কৌশলটা শিখে নিতুম দুঃখের ভিতর দিয়ে গিয়ে। দশ বছর দুঃখ পেলে যদি এক বছর সুখ মেলে তো তাতেই আমি রাজী।

কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় সে রকম বলে না। সুখের জন্যে আমি ভালোবাসিনি। তবে ভালোবেসে সুখ পেয়েছি। আর পেয়েছি দুঃখ। মালাও কি দুঃখ পাবে? কে জানে। হয়তো পাবে। তা হলে কেন বলি ভালোবাসতে বিয়ে করতে সুখী হতে? একটার সঙ্গে আরেকটার লজিকাল সম্পর্ক কী? কিছুই না। এমনি ওটা একটা কামনা, একটা আশা। সব মানুষের অন্তরের বাসনা ভালোবেসে বিয়ে করা, বিয়ে করে সুখী হওয়া।

"কী বলছিলে, মালা? সুখের সূত্র আমার এই?" মনে

পড়ল তার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে সে নীরবে অপেক্ষা করছে। তার চোখে স্থির প্রদীপের আভা।

"কত রকম সুখ আছে জীবনে। এই যেমন রামধনু দেখে সুখ। আবার রামধনু এঁকেও সুখ। আমার নিজের খেয়ালের রামধনু। প্রকৃতির প্রতিকৃতি বা অনুকৃতি নয়। সুখের কি সংখ্যা আছে না সংজ্ঞা আছে? কিন্তু সব বলার পর যা বাকী থাকে তা এই।" আমি তার খোলসা করতে পারিনে। ইঙ্গিতে বোঝাই।

"তা এই?" মালা বোঝে। শুধু নিশ্চিত হতে চায়।

"তা এই।" আমি নিশ্চয়তা দিই।

মালা উঠে দাঁড়ায়। বলে, "সোনার শুকপাখী আনতে যেতে হবে এ কথাটাও বাকী। যাতে সকলের সুখ তাই তো সুখ।"

শুনে চমক লাগে। ব্যথাও লাগে। মালা যে সকলের সুখের জন্যে মায়াপাহাড়ের বিভীষিকার অভিমুখে নিঃসঙ্গ যাত্রা করবে এ কি আমি সমর্থন করতে সহ্য করতে পারি? না, না। আমার একটুও ভালো লাগে না এ কথা ভাবতে। অথচ কী এমন উপায় আছে যা দিয়ে আমি ওর গতি রোধ করতে পারি, ওর মতি পরিবর্তন ঘটাতে পারি? সাধ্য যদি কারো থাকে তবে তা ওর প্রেমাস্পদের। আমার নয়।

কিন্তু ও যে প্রেমে পড়েছে এটা তো আমার অনুমান। এর উপর ভিত্তি করে বলতে কি পারি কিছু? বলা উচিতও নয়।

আমি অনধিকারী। আমি কে যে একটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে প্রেম নিয়ে আলোচনা করব? নীলির সঙ্গেও যা করিনি।

ব্যথিতভাবে পরিহাস করে বলি, "যাদের জন্যে তুমি সোনার শুকপাখীর সন্ধানে যাবে তারা কিন্তু সোনার লক্ষ্মীপেঁচা হাতে পেলেই স্বর্গসুখ পায়। ইহলোকে স্বর্গরচনার যতগুলো পরিকল্পনা দেখি সর্বত্র লক্ষ্মীপেঁচাকী জয়।"

"আপনি তা হলে লক্ষ্মীপেঁচার অন্বেষণে যান।" মালা আমার মুখের উপর ছুঁড়ে মারে এই উক্তি। মেয়েটা পরিহাস বোঝে না।

আরো ব্যথা পাই। বুকে আরো বাজে। আমি শিল্পী। আমি কি ধনের জন্যে ছবি আকছি? ধনী হবার এটাও কি একটা পথ? যা আমি বেছে নিয়েছি আমার জীবনে? হায়, কন্যা! কেমন করে তোমায় আমি বোঝাই যে আমার অন্বিষ্ট লক্ষ্মীপেঁচা নয়। নয় শুকপাখীও। আমি যাকে খুঁজে ফিরছি তার নাম সৌন্দর্য। তার প্রতীক নীলপাখী।

সেই যে নির্মল বলে ছেলেটি মেসোমশায়ের সহকারী তার সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার আলাপ জমেছিল। যদিও সে বিজ্ঞানের ঘরানা তবু আর্টের খবরও মন্দ রাখে না। বিশেষ করে সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রকলার। আমার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই আমার কাজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। আমাকে সমীহ করে। তার ধারণা আমি যে ইণ্ডিয়ান আর্টের বিশেষণ অংশটার উপর তেমন ঝোঁক না দিয়ে বিশেষ্য অংশটার উপর দিই সেইটেই

ঠিক। বিপরীতটা বেঠিক। ছবি যদি আর্ট হিসাবে না বাঁচে তার স্বদেশিয়ানা কি তাকে তরাবে? নির্মল তাই আশ্চর্য হলো যখন শুনল যে আমি ভারতীয় পরম্পরার মধ্যে নিজের স্থান খুঁজতে বেরিয়েছি। আমি যদি ভারতীয় না হই তো আমি কেউ নই।

ছেলেটি মালার কাছাকাছি বয়সী। কিন্তু বিলকুল অন্য ধাতের। ঘোরতর বাস্তববাদী ও যুক্তিনিষ্ঠ। যেমন বিজ্ঞানের প্রতি তেমনি জীবনের প্রতি তার সমীপবর্তিতার ধারাটা প্র্যাকটিকাল। রূপকথার জগৎ থেকে সহস্র যোজন দূরে। তা বলে আমার জগতের নিকটতর নয়। দেশে আকাল পড়লে সে আমার মতো পালিয়ে বেড়াবে না। ঘটনাস্থলে গিয়ে অনুসন্ধান করবে। রিপোর্ট তো লিখবেই, চাঁদা তুলে লঙ্গরখানা খুলবে ও বহুলোককে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে। বাঁচানোর ওই একটিমাত্র অর্থ সে জানে ও বোঝে। মালার মনের দুয়ার তার কাছে রুদ্ধ। কিন্তু এমনিতেই তাদের দু'জনায় খুব ভাব। মালার ময়ূরের জন্যে জালি দিয়ে ঘেরা অষ্টাবক্র ঘরখানা তারই তদারকে গড়া। ডিজাইনটা যদিও মালার নিজের।

দু'জনায় খুব ভাব এলাহাবাদে এসে হয়েছে তা নয়। জাপানীরা যখন বর্মা আক্রমণ করে তখন নির্মলরা রাতারাতি রেঙ্গুন ছেড়ে উত্তর দিকে পালায়। তারপর হাঁটা পথে ভারত প্রবেশ করে। সে এক রোমহর্ষক কাহিনী। বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে তাদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভরসা ছিল না। কে

জানে জাপান যদি বাংলাদেশে হানা দেয়। তা হলে তো আবার দৌড়তে হবে। তার চেয়ে বেশ কিছু দূর এগিয়ে থাকা ভালো। এলাহাবাদে তখন বাস করা স্থির হয়। মেসোমশায়রা তখনো সেখানে হাজির হননি। নির্মল বেকার বসেছিল। মেসোমশায় তাকে উদ্ধার করলেন। সেও হলো তাঁর দক্ষিণ হস্ত। পুরোনো ভাবটা ঝালিয়ে নেওয়া গেল। দুই পরিবারের মধ্যে। মাঝখানে দীর্ঘ একটা ছেদ। সেটা প্রবাসের ও দুর্দিনের কল্যাণে হ্রস্ব হয়ে এলো।

নির্মলকে দেখে বিশ্বাস হয় না যে সে রূপকথার রাজপুত্র। মালা তা হলে কী মনে করে তাকে ভালোবাসবে? ভাব আর ভালোবাসা একই কথা নয়। নির্মলের সঙ্গে আমি অনেক দিন টাঙ্গায় করে বেড়িয়েছি। সে আমার ও আমি তার গাইড। নতুন এলাহাবাদ আমার অচেনা, তার চেনা। পুরোনো এলাহাবাদ তার অচেনা, আমার চেনা। দেখতে দেখতে তার সঙ্গে আমারও ভাব হয়ে যায়। যদিও বয়সের ব্যবধান মালার তুলনায় বেশী। নির্মলকে বাজিয়ে দেখি সে প্রেমে পড়েনি। মালা যদি তার প্রেমে পড়ে থাকে তবে সেটা এখনো তার অগোচর। মালা তবে কার প্রেমে পড়েছে? নির্মলকে জিজ্ঞাসা করিনে। করতে অনিচ্ছা জাগে। কে জানে সেও হয়তো আমারি মতো অজ্ঞ। হয়তো আমার চাইতেও। হয়তো খবরই রাখে না যে মালা কোনো একজনকে ভালোবেসেছে।

এলাহাবাদে আমি থাকতে আসিনি। মেসোমশায়ের প্রতিকৃতি অঙ্কনের অজুহাতে আর কতদিন থাকা যায়! অথচ যেতে আমার পা ওঠে না। খাজুরাহো বহু দূর। একা কেমন করে যাই? সাথী যদি জোটাতে পারতুম একজনকে। নির্মল হলেও মন্দ হতো না। গড়িমসি করি। এমন সময় মালা দিল আমাকে আঘাত। আমাকে লক্ষ্মীপেঁচার অন্বেষণে যেতে বলে।

এর পরে একদিন নির্মলকে বলি, "খাজুরাহো আমার লক্ষ্য। এলাহাবাদ আমার পথে পড়ে। কিন্তু এখন দেখছি কবে আমার ব্রেক-জার্নির মেয়াদ পেরিয়ে গেছে। নড়তেও আর পা সরছে না। টাঙ্গায় চড়েই আমি য়্যাডভেঞ্চারের সুখ পাই।"

"তা হলে থেকেই যান না, দেবুদা।" মালার দেখাদেখি নির্মলও আমাকে 'দেবুদা' বলে ডাকে। খাজুরাহো সম্বন্ধে তারও যথেষ্ট ঔৎসুক্য। কিন্তু সে এইমুহূর্তে সাথী হতে নারাজ।

"কিন্তু মাসিমার স্নেহমমতার সুযোগ নিয়ে আর বেশীদিন তাঁদের ওখানে থাকা চলে না। মেসোমশায়ের প্রতিকৃতি তো পর্যাপ্ত ঋণশোধ নয়।" বলি একটু কুণ্ঠা সহকারে।

"বেশ তো। আমার ওখানে আপনার জায়গা হবে। মন খুঁৎ খুঁৎ করলে ভাড়াহিসেবে যা খুশি দেবেন। যতদিন খুশি থাকবেন।" নির্মল বলে উৎসাহভরে।

"না, না, তোমাদের অসুবিধে হবে।" আমি পেছিয়ে যাই। জানি ওর সঙ্গে থাকেন ওর বিধবা মা, বিধবা বোন ও

ছোট ছোট দুটি ভাগনে। পাড়াটাও ঘিঞ্জি। বাড়ীটাও পুরোনো। একখানামাত্র বাথরুম।

নির্মল আমার মুখ দেখে আঁচ করে বলল,. "অসুবিধে আমাদের নয়, আপনারই হবে। পরে ভালো একটা আস্তানা খুঁজে নেবেন।"

বিবেচনা করতে সময় চাই। আশঙ্কার কথা মাসিমার বাড়ী ছেড়ে নির্মলের ওখানে উঠে গেলে তিনি তার অন্য অর্থ করবেন। বিরূপ হবেন শুধু আমার উপর নয়, নির্মলেরও 'পরে। আর কোনো বাসা কি পাওয়া যায় না। সন্ধান নিয়ে দেখি যেখানে যা খালি ছিল বর্মাওয়ালারা দখল করে বসে আছে। জাপান কবে হারবে, কবে ওরা বর্মায় ফিরে যাবে। তার পর আবার খালি হবে।

তাদের আশাবাদের হেতু ছিল। জাপান আর ভারতের দিকে এগোয়নি। দেড় বছর হলো তটস্থ হয়ে রয়েছে। তার মতিগতি থেকে মনে হয় না যে সে ভারতের মাটিতে এসে "যুদ্ধং দেহি" বলবে। ওদিকে দুর্ভিক্ষের উপর নতুন বড়লাটের নজর পড়েছে। এর আগে ছিলেন তিনি জঙ্গীলাট। জঙ্গী ধরনে দুর্ভিক্ষ দমনে লেগে গেছেন। পারবেন বলে ভরসা হয়।

তা হলে কলকাতায় ফিরে যাইনে কেন? একদিন আচমকা এই চিন্তা মাথায় এলো। খাজুরাহো না হয় এযাত্রা বাকী রইল। রইল বাকী রাজস্থান ও পাটন। বেঁচে থাকলে হবে অন্য কোনো সময়। ভারতীয় শিল্পীপরম্পরা কি চাক্ষুষ

দর্শনের অপেক্ষা রাখে? বই পড়ে প্রতিলিপি দেখে কি হয় না? হয় বইকি। নইলে খরচ বাড়ে।

হাঁ, সেটাও একটা ভাববার কথা। আমার আর সে বয়স নেই যে একবস্ত্রে ভাবত বেড়িয়ে আসব আহারনিদ্রার অবহেলা করে। যত্রতত্র খেয়ে ও থেকে। নির্মলকেই প্রথম জানাই, "ভাবছি কলকাতা ফিরে যাব।"

"সে কী! কলকাতা!" নির্মল আশ্চর্য হয়ে সুধায়, "হঠাৎ?"

"সেখানে," একটু রহস্যময় করে বলি, "লক্ষ্মীপেঁচা থাকে।"

"লক্ষ্মীপেঁচা! তার মানে!" সে বিস্ময়বিমূঢ়।

বুঝিয়ে বলি তার মানে। সে হো হো করে হেসে ওঠে। টাঙ্গাওয়ালা পিছন ফিরে তাকায়। আমি কিন্তু গম্ভীর।

বলি, "খালি রুটি খেয়ে মানুষ বাঁচে না। কিন্তু বাঁচতে হলে রুটিও চাই। মুক্তা ঝরার জল খেয়ে কি পেট ভরে?"

"তার মানে কী হলো, দেবুদা!" নির্মল আবার বিমূঢ় হয়।

আবার বোঝাতে হয় তাকে। এবার কিন্তু তার হাসি পায় না। তার ধোঁকা লাগে।

এবার আমি ভেঙে বলি, "ছেলেবেলায় কে না বিশ্বাস করে যে এটা রূপকথার জগৎ! কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। মালার কিন্তু এখনো বিশ্বাস যে আমাদের এটা রূপকথার জগৎ। সোনার শুকপাখী আর মুক্তা ঝরার জল এসব নাকি সত্যি কোনো এক মায়াপাহাড়ে গেলে পাওয়া যায়।

এসব পাওয়া নাকি খুব জরুরি। যুদ্ধে যারা নিহত হচ্ছে তাদের বাঁচানোর জন্যে, বাঁচানোর পর তাদের সুখী করার জন্যে।"

নির্মল স্তম্ভিত হয়ে মন্তব্য করে, "তাজ্জব!"

"যা বলেছ।" আমি তার পিঠ চাপড়ে দিই। আমার বুঝতে বাকী থাকে না যে মালা নির্মলকে বলেনি। বলত না কেন, যদি প্রেমে পড়ে থাকত নির্মলের?

"মালা মেয়েটা বরাবরই আন্‌প্র্যাকটিকাল।" নির্মল আমাকে শোনায়। "তা বলে এতদূর পাগল!"

"এখন এই পাগলের ভার নেয় কে? বাপ মা থাকতেই এই। কাজেই তাঁরা অপারগ। এখন তুমিই একমাত্র ভরসা।" আমি আঁধারে ঢিল ছুঁড়ি।

"আমি!" নির্মল যেন আকাশ থেকে পড়ে। টাঙ্গা থেকে নয়। কী ভাগ্যি!

বেচারার চেহারা দেখে আমার সংশয়মোচন হয়। না, নির্মল নয়। তবে কে? কাকে মালা দিতে চায় মালা? অশিষ্ট আমার কৌতূহল। কিন্তু অদম্য।

"তুমি যদি না হও তবে তোমারি মতো আর কোনো নওজোয়ান। মালা যাকে রূপকথার রাজপুত্র বলে চিনেছে।" আমি ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে তাকাই।

"কই, আমার তো চোখে পড়ে না। এক মনোরমা কণ্ডলকেই বার বার দেখি।" নির্মল আমার মনেও ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়।

ছয়

মেসোমশায়ের প্রতিকৃতি সমাপ্ত করে তাঁর সামনে তুলে ধরতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি কে হে, দেবপ্রিয়? চিনি চিনি মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠিক চিনতে পারছিনে।"

এতদিন তাঁকে জানানো হয়নি যে আমি তাঁর প্রতিকৃতি আঁকছিলুম। মাসিমা জানতেন। মালা জানত। কিন্তু তাঁর জন্মদিনে তাঁকে একটা সারপ্রাইজ দেবার মানসে আমরা তিনজনেই চুপ করে ছিলুম। নির্মলও। কৌশলে আমি তাঁর মুখের আদরা এঁকে নিয়েছিলুম তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁর ল্যাবরেটরিতে বসে।

"ইনি," আমি হাসি চেপে বললুম, "একজন ভারতীয় ঋষি। ঋষির আইডিয়াটাই ফোটাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেকালের ঋষি নন। তাই দাড়িগোঁফ বা জটাজুট নেই। একালের ঋষি ধ্যান করছেন টেস্ট টিউব হাতে নিয়ে। তপোবনে নয়। ল্যাবরেটরিতে।"

এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হলো। তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "ওহে, আমি নয় তো? য়্যাঁ! আঁকলে কী করে? কবে? কই, সিটিং দিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না। এই দেখ, তোমরা ইমপ্রেশনিস্টরা কী সাংঘাতিক লোক!"

আমরা অবশ্য ইমপ্রেসনিস্ট বলে পরিচয় দিইনে। আমরা পোস্টইমপ্রেসনিস্ট। কিন্তু কী হবে তর্ক করে? মেসোমশায় যে চিনতে পেরেছেন এই ঢের। চেনা দুঃসাধ্য। আমরা তো অনুকৃতি আঁকিনে। আমরা তো ফোটোগ্রাফার নই। আমরা ভাবগ্রাহী।

মেসোমশায় সত্যি খুব খুশি হলেন। তিনি তো বোঝেন এ ধরনের কাজ এ দেশে দুর্লভ। কিন্তু মাসিমার উৎসাহ নিবে গেল। তাঁরও প্রতিকৃতি আমি আঁকি এ রকম একটা প্রত্যাশা তাঁর ছিল। নমুনা দেখে তাঁর চক্ষুস্থির।

কেন আর এলাহাবাদে থাকা? একদিন টিকিট কেটে পূর্বগামী ট্রেনে উঠে বসা গেল। আরো পশ্চিমে যাবার সংকল্প আপাতত পরিত্যক্ত হলো। ভারতীয় শিল্পীপরম্পরার সঙ্গে আমি মনে মনে সন্ধি করেছিলুম। আমিও তাঁদেরি মতো ভারতীয়, আমিও তাঁদেরি মতো শিল্পী, আমিও অন্তরে অন্তরে ভারতীয় শিল্পী, অথচ আমি বিংশ শতাব্দীর জীবনের মধ্যে জীবিত, স্পন্দনের মধ্যে স্পন্দিত, গতির মধ্যে গতিমান, বেগের মধ্যে বেগবান। সেইসূত্রে ইউরোপের নিকটতর। এত নিকট যে প্রায় অভিন্ন।

কলকাতা ইতিমধ্যে বদলেছে। এ নগরী দিনে দিনে বদলায়। যতবার দেখি ততবার দেখি আর একটু কম পুরাতন, আর একটু বেশী নূতন। মন্বন্তর নিয়ে আর কেউ ভাবছে না। চলতি গুজব আই এন এ। ভারতের মুক্তিবিধাতা নাকি বর্মায়

পৌঁছে গেছেন। যে-কোনো দিন স্থলপথে ভারতপ্রবেশ করবেন"।

দেখি আমার বন্ধুরা কেউ বসে নেই। আস্ত একটা বাজার সাগর পার হয়ে এসেছে। মার্কিন সৈনিকরা ভারতীয় ছবির সওদা করছে। দেশে নিয়ে যাবে স্মরণচিহ্ন রূপে। বন্ধুরা তাই ভারতীয় ছবির যোগান দিতে দিনরাত খাটছেন। তার মধ্যে ছবিত্ব না থাক, ভারতীয়ত্ব থাকলেই হলো। আমিও তাদের সঙ্গে ভিড়ে যাই।

এই রোজগারের মরসুমে আমি আর কোনো দিকে তাকাবার অবসর পাইনি। না লিখেছি চিঠি, না দিয়েছি চিঠির জবাব। খোঁজ নিইনি মেসোমশায় কেমন আছেন। মালা কী করছে। তার মায়াপাহাড় যাত্রার কতদূর। তার ভালোবাসার কী খবর।

যুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি। তবে তার ফলাফল একরকম জানা গেছে। কলকাতা নিরাপদ। তার চেয়ে বড় কথা প্যারিসের মুক্তি আসন্ন। আমি এ ক'বছরে যা জমিয়েছিলুম তা দিয়ে জাহাজের প্যাসেজের বায়না করলুম। যুদ্ধের পর প্রথম জাহাজে যারা যাবে তাদের মধ্যে থাকবে আমার নাম। জানি একবার প্যারিসে পৌঁছতে পারলে আর সব আপনি হবে। আঃ! কত বড় একটা বাঁচোয়া যে বিয়ে করিনি, বাঁধা পড়িনি।

কিন্তু মা দেখলুম দস্তুরমতো প্রতিকূল। গেলে তো ফিরতে আবার সাত আট বছর। ততদিন কি তিনি বেঁচে

থাকবেন ? নিতান্তই যদি যাই তবে বিয়ে করে বৌ রেখে যেন যাই। বৌ হবে আমার জামিন বা হস্‌টেজ। শেষে মা'র সঙ্গে রফা হলো আমি এক বছরের বেশী বাইরে থাকব না। ফিরে এসে বিয়ের কথা ভাবব।

টোগো য়্যাডমিরাল হয়নি। স্থায়ী কমিশন পায়নি। তাকে ওরা যুদ্ধের পরে বিদায় দেবে। তার তাতে ক্ষোভ নেই। সে চেয়েছিল য়্যাডভেঞ্চার। তা মন্দ হয়নি। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে চায়। জাহাজের কারবারে ঠাঁই করে নিতে পারবে। মা তা হলে মেয়ে জামাইকে কাছে পাবেন। তাঁর দেখাশোনার জন্যে আমার আবশ্যক নেই। আমি স্বচ্ছন্দেই একটা বছর প্যারিসে কাটিয়ে আসতে পারি।

এইসব জল্পনাকল্পনা হচ্ছে এমন সময় মাসিমার একখানা চিঠি এসে হাজির। এলাহাবাদ থেকে নয়। কলকাতার পার্ক সার্কাস থেকে। আমাকে ডেকেছেন চা খেতে। আমি তো অবাক। কবে এলেন, এমনি বেড়াতে না বরাবরের জন্যে, সবাই এসেছেন না একা তিনি, কিছুই খুলে বলেননি। টেলিফোন নম্বর দেননি। অগত্যা কৌতূহল চেপে রাখতে হলো।

গিয়ে দেখি মাসিমা তাঁর বান্ধবী মিসেস মুখার্জির অতিথি। মালা নেই। মেসোমশায়ও না। ব্যাপার কী ? তিনি এক কথায় জানালেন যে কলকাতায় থাকা যখন নিরাপদ তখন মিছিমিছি এলাহাবাদে পড়ে থেকে কী হবে ? কাছেই এক

টুকরো জমির সন্ধান পেয়ে দেখতে এসেছেন। পছন্দ হলে ছোট একটা বাড়ী তৈরি করা যাবে।

তার পর মাসিমার সঙ্গে যেতে হলো জমি দেখতে। জমিটা ভালো। কিন্তু পাড়াটা বাজে। আমি বললুম, "এত রাজ্যি থাকতে পার্ক সার্কাস! তাও বস্‌তির মাঝখানে!"

"বণ্ডেল রোডের বাড়ীখানা জলের দরে ছেড়ে দিয়ে কী মূর্খতাই না করেছি!" মাসিমা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "এখন পুঁজি কোথায় যে মনের মতো পাড়ায় বাড়ী করব? কর্তা চান প্রচুর ফাঁকা জায়গা। আমি চাই ট্রাম লাইনের কাছাকাছি। মালা চায়—মালা অবিশ্যি মুখ ফুটে বলে না সে কী চায়, আমার মনে হয় সে চায় নিরিবিলি। সব দিক মেলাতে হলে এই অঞ্চলেই ডেরা তুলতে হয়।"

তিনি শহর থেকে দূরে যেতে নারাজ। নইলে টালিগঞ্জ প্রস্তাব করতুম। যাই হোক মাসিমার কথায় সায় দিলুম। তিনি আমার উপর ভার দিলেন কোনো ইউরোপীয় বাস্তুশিল্পীকে দিয়ে বাড়ীর ডিজাইন প্রস্তুত করার। তিনি স্বাদেশিকতার পক্ষে নন। তিনি নিশ্চিত জেনেছেন যে ওসব তপোবন টপোবন এ যুগে অচল। আবার যদি কখনো বেচে দিতে কি ভাড়া দিতে হয় তপোবন শুনলে এ কালের বড়লোকেরা পেছিয়ে যাবে। ভালো দাম বা ভালো ভাড়ার উপর নজর রাখতে হলে খানদানীদের নয় ভুঁইফোঁড়দের রুচি মেনে চলতে হয়।

মাসিমা এলাহাবাদে ফিরে গেলেন। সেখান থেকে আমাকে

চিঠি লিখতে ও তাগিদ দিতে থাকলেন। আমার হাতের কাজের সঙ্গে এই উপরি কাজ যোগ দিয়ে আমাকে মাতিয়ে রাখল। আমার জাহাজ হাতছাড়া হলো। গৃহনির্মাণের কাজেও মাসিমা আমার সহায়তা চাইলেন। দোসরা জাহাজের জন্যে ভাবি কখন? ইচ্ছা রইল মাসিমাদের নতুন বাড়ীতে স্থিতিবান করে দিয়ে তার পরে সমুদ্রে ভাসব।

যুদ্ধ সত্যি সত্যি শেষ হলো। হিরোশিমা আমার বিবেকে বিঁধল বটে, কিন্তু আর সকলের মতো আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। ব্ল্যাক আউট তো কেবল বাইরে নয়, মনেরও নিষ্প্রদীপ ঘটেছিল। ফাসিস্টদের যে পতন হলো এটা ধর্মের জয় কি না জানিনে, কিন্তু অধর্মের পরাজয় তো বটেই। দূর থেকে ফরাসীদের সঙ্গে উৎসব করতে সাধ গেল। কলকাতায় বসে যতটা সম্ভব। মস্ত একটা পার্টি দিলুম বন্ধুদের। চাইনীজ রেস্টোরাণ্টে।

মাস কয়েক পরে মাসিমারা গৃহপ্রবেশ করলেন। লক্ষ করলুম মাসিমা যেমন আহ্লাদে আটখানা মেসোমশায় তেমনি বিষাদে ম্রিয়মাণ। মনে হলো তাঁর পরাভব ঘটেছে। মহাযুদ্ধে নয়, গৃহযুদ্ধে। আর মালা? মালার দিকে তাকালে মনে হয় যেন একটা দ্বন্দ্ব চলেছে তার অন্তরে আর বাইরে। তাই তার চেহারা কেমন শুকনো আর বিরস আর ক্লান্ত। দৈর্ঘ্যে বেড়েছে। প্রস্থে ক্ষীণ।

আবার বুধবার বুধবার হাজিরা দিতে হলো। তেমনি

বিসেপশন। অথচ তেমনি নয়। মাঝখানে চার বছর ব্যবধান। ছেঁড়া তার জোড়া লাগে না। আগেকার দিনের সে দলটা ভেঙে গেছে। কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন যারা আসে তাদের মন অশান্ত ও চালচলন অস্থির। যেন তাদের জীবন থেকে শ্রী হারিয়ে গেছে। লালিত্য মিলিয়ে গেছে। পড়ে আছে উৎকট বাস্তববাদ। তারা অনেক খবর রাখে। তাদের মুখ দিয়ে কথার তুবড়ি ছোটে। তারা সব পারে। দরকার হলে সাধারণ ধর্মঘট, সশস্ত্র বিদ্রোহ, দাঙ্গাহাঙ্গামা। তাদের জীবনদর্শন হলো, "বাঁচতে তো হবে।"

দেখি মাসিমাও তাদের সঙ্গে একদিল্। কথায় কথায় তিনিও বলেন, "বাঁচতে তো হবে।" এই আবহাওয়ায় আমি বেশীক্ষণ মাথা ঠিক রাখতে পারিনে। তর্ক করতে যাই। তর্কের উত্তরে শুনি, "আপনি, মশায়, ইউরোপীয়ান। আপনি তো অমন বলবেনই।" তখন তর্কে ভঙ্গ দিই। সঙ্গে সঙ্গে উঠি। মালা আমার দিকে অসহায়ভাবে তাকায়। আর মেসোমশায় তো নীরব শ্রোতা। তিনি একটিও কথা বলেন না, বললে নেহাৎ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। এই যেমন, "টোগো আজকাল কী করছে হে? নীলিকে দেখিনে কেন?"

মালার সঙ্গে বাক্যালাপের সুযোগ বিশেষ হয় না। জানতে ইচ্ছা করে কী তার মনে আছে। তার অন্তরের সমাচার। নীলি ছিল এককালে তার ও আমার মাঝখানে সেতু। সে এখন তার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। মালাকে একদিন

সে জিজ্ঞাসা করেছিল কেন এলাহাবাদ থেকে চলে আসা হলো। মালা বলেছিল, "সে অনেক কথা।"

একদিনে নয়, একটু একটু করে নানা সূত্রে আমি জানতে পাই অনেক কথা বলতে কী বোঝায়। মেসোমশায় চেয়েছিলেন আরো পশ্চিমে ও আরো উত্তরে যেতে। লছমনঝোলায় কি আলমোড়ায়। মাসিমা রাজী হননি। তাঁর পিছুটান কলকাতামুখে। মালা চেয়েছিল নারীসঙ্ঘে যোগ দিয়ে গ্রামের কাজে নামতে। মাসিমা রাজী হননি। এলাহাবাদ শহরে বসে মা'র চোখে চোখে থেকেও যে হরিজন মেয়েদের জন্যে পাঠশালা চালাবে তার জো নেই। ছোটলোকদের সঙ্গে মেশা চলবে না। কী তা হলে সে করবে? পড়াশোনা তো শেষ। মাসিমা বলেন সঙ্গীত শিখবে। এলাহাবাদ সঙ্গীতচর্চার পক্ষে প্রশস্ত। মালা যে সঙ্গীত ভালোবাসে না তা নয়। কিন্তু তার আন্তরিক ইচ্ছা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া। পাঁচজনকে নিয়ে কাজ করা। যেমন করছে মনোরমা কওল। সে এখন একজন বিখ্যাত নেত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী।

অবশ্য মনোরমার সঙ্গে মালার ঠিক মেলে না। মালার জীবন রূপকথার রেখা ধরে চলেছে। সে চায় বাঁচাতে। সে চায় তৃষ্ণার জল বয়ে এনে মুখে দিতে। সে চায় সুখী করতে। অসুখ সারাতে। নিছক রাজনীতি তার কাছে তুচ্ছ। নিছক যুদ্ধবিগ্রহই তাকে মাতায় না।

নীলি জানতে চেষ্টা করেছিল মালা তার রাজপুত্রের দেখা

পেয়েছে কি না। মালা ধরাছোঁয়া দেয়নি। দেখা একজনের পেয়েছে, হয়তো, সে জন কিন্তু রাজপুত্র নয়। তাকে ভালোবেসেছে কি? কে জানে কাকে বলে ভালোবাসা! নীলি তখন জানায় যে ভালোবাসা হচ্ছে বিয়ে করতে চাওয়া। মালা হাসে। বলে, না, সে রকম কোনো অভিপ্রায় নেই। বিয়ে করলে ভালোবাসা উড়ে যেতেও পারে।

মাসিমা টের পেয়েছিলেন বই কি। না পেলে কি এলাহাবাদের চাকরিটা অকালে ছেড়ে আসতে মেসোমশায়কে প্রবর্তনা দিতেন? চাকরি কি চাইলেই পাওয়া যায়? তা ছাড়া ওটা ছিল জীবিকার চেয়ে বড়। ওটা ছিল জীবনের কাজ। মেসোমশায় কি মাসিমার কথায় জীবনের কাজ ছেড়ে চলে আসতে রাজী হতেন? হলেন মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবেই। মেয়েকে তো যার তার হাতে সঁপে দেওয়া যায় না। বেশীদূর গড়াতে দিলে সঁপে দিতে হতোই। এসব ক্ষেত্রে স্থানত্যাগের বিধান আছে। অবশ্য নিজেরা স্থানত্যাগ না করে মালাকে স্থানান্তরে পাঠাতে পারতেন। তা হলে মালা দুঃখ পেতো। বিদ্রোহী হতো কি না কে জানে! তাকে তো ছেলেবেলা থেকেই শেখানো হয়েছে যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হয়। না, মেয়েকে কাছে রাখাই নিরাপদ।

মেসোমশায় যে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হচ্ছেন তা কি আমার জানতে বাকী ছিল? মেয়েকে যার তার হাতে সঁপে দেওয়া যায় না, এটা কেবল মেয়েলি শাস্তর নয়। মহাপণ্ডিতরাও এটা

মানেন। মেয়েকে যার তার হাতে সঁপে দিলে তার পরিণামে মেয়েই কষ্ট পাবে। তাকে তার কৃতকর্মের পরিণাম থেকে রক্ষা করাই কর্তব্য। যদিও তার বয়স হলো চব্বিশ কি পঁচিশ তবু তার নিজের বিবেচনার উপর তার বিবাহের নির্বন্ধ ছেড়ে দেওয়া যায় না। সে ভুল করবে। তার জন্যে পরে পশতাবে। তখন কিন্তু আর পিছু হটবার উপায় থাকবে না। বিয়ে একবার করলে চিরকালের মতো করা হয়ে যায়। বিশেষ করে মেয়েদের বেলা। স্বামী চিরদিন স্বামী। জীবনে আর সব ব্যাপারে পুনর্বিবেচনার অবকাশ আছে। কিন্তু বিবাহ ব্যাপারে একবার যদি অবিবেচনা ঘটে তবে চিরকাল তার জের চলে। মাসিমার মতো মেসোমশায়েরও এই ধারণা।

বুঝি সব। কিন্তু সমর্থন করতে পারিনে প্রবীণদের এই মূঢ়তা। মালার উপর ছেড়ে দিলে সে হয়তো ভুল করত, কিন্তু সে ভুল এমন ভুল নয় যা সংশোধনের অতীত। সমাজের মনে লাগবে, লোকে নিন্দা করবে, কেলেঙ্কারিতে কান পাতা দায় হবে। সব সত্যি। তবু এ কখনো হতে পারে না যে একটি মেয়ে যদি একটা ভুল করে থাকে তবে তা সংশোধনের অতীত, অতএব তাকে ভুল করতে দেওয়া হবে না, ঠিক করতেও দেওয়া হবে না, তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হবে। মেয়েদের বিয়ে যখন বারো তেরো বছরে দেওয়া হতো তখন যা নীতি ছিল এখন বিয়ের বয়স দু'গুণ হলেও সেই একই নীতি খাটানো হবে। মালাকে যে ছেলেবেলা থেকে ঢের বড় বড় কথা

শেখানো হয়েছে সেসব তা হলে কাজের কথা নয়। কাজের বেলা ঠাকু'মা দিদিমাদের মেয়েলি শাস্তর।

যাক গে। আমার কী? আমি কে? আমার অত মাথাব্যথা কিসের? আমি আমার চিত্রসাধনায় মগ্ন থাকতে চাই। আফসোসের বিষয় প্যারিসে যাবার সেই পরিকল্পনাটা কবে ভেস্তে গেছে। মাসিমার বাড়ী বানানোর ধান্দায়। তার পর আর আমি উদ্যোগী হইনি। জাহাজের পর জাহাজ হাতছাড়া হতে দিয়েছি। আগ্রহ কিছুমাত্র কমেনি। কিন্তু পালটা আকর্ষণে ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলছি। মালা সম্বন্ধে কৌতূহল। তার রুচি সম্বন্ধে কৌতূহল। কাকে তার মনে ধরেছে। কে তার ভালোবাসা পেয়েছে।

বল দেখি এসব কথায় আমার কী? কেনই বা আমি আমার প্যারিসযাত্রা স্থগিত রাখি আর মাকে স্তোক দিই? অথচ মাসিমার ওখানেও নিয়মিত হাজিরা দিতে গাফিলতী করি। তবে ছবি আঁকা আমার বন্ধ থাকে না। পেটের দায়ে বল, প্রাণের দায়ে বল, স্বপ্নের দায়ে বল কাজ আমাকে প্রতিদিন করে যেতে হয়। কাজ যেদিন করিনে ভাত সেদিন খাইনে। নেই খাটুনি তো নেই খাওন। লেনিনের মতো আমার ফতোয়া। নিজের উপরেই আপাতত ওটা জারি হচ্ছে। পরে দেশের লোকের উপরেও হবে। কথায় কথায় এরা হরতাল করে। হরতালের দিন অনশনের বিধান দিলে কর্মে মতি হবে। নেই খাটুনি তো নেই খাওন।

মালা বস্তির ছোট ছোট মেয়েদের খেলার ছলে লেখাপড়া শেখাতে চায় আর সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যের নিয়মকানুন, যতটুকু তার জানা। এই নিয়ে একদিন কথা কাটাকাটি হয়ে গেল মাসিমার সঙ্গে। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, "আমি তো হদ্দ হয়ে গেলুম বোঝাতে বোঝাতে। এখন তুমি যদি বোঝাতে পারো। কাজটা যে ভালো তা তো আমি অস্বীকার করছিনে। কিন্তু যে মেয়ে এম এ পাশ করেছে সে কেন বস্তির মেয়েদের নিয়ে সময় নষ্ট করবে? পড়াতে চায় কলেজে চাকরি নিক। কিংবা হাই স্কুলে।"

আমার কতকগুলো কৌশল আছে যা দিয়ে আমি কথা বার করি। সেদিন মাসিমার আপত্তির আসল কারণটা জেরা করে বার করলুম। বস্তিটা মুসলমানদের। ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে মিশতে গেলে বড় বড় গুণ্ডাদের নেকনজরে পড়তে হবে। তারা ত্যাগের মহিমা জানে না। জানে একটি জিনিস। সেই ভয়ে মুসলমান মহিলারা বোরকায় সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখেন। নইলে উলটে দোষ দেওয়া হয় ওঁদের। কেন ওঁরা পুরুষদের প্রলুব্ধ করতে যান। মালাকেও উলটে দোষ দেওয়া হবে তো? রটানো হবে যে মেয়েটাই নষ্টের গোড়া। মালা না হয়ে নীলি হলে কি আমি তাকে মুসলমানদের বস্তিতে মেয়েদের পাঠশালা খুলতে দিতুম? কিংবা বস্তির মেয়েদের ডেকে এনে বাড়ীতেই পাঠশালা বসাতে?

বুকে হাত রেখে বলতে পারব না যে মুসলমান গুণ্ডাদের

নামে ভয় পাইনে আমি। পাই। পাই। একটু আধটু পাই। মাসিমা আমার মনের দুর্বল জায়গায় ঘা দিলেন। আমাকে মানতেই হলো যে নীলিকে আমি ও রকম কোনো ঝুঁকি নিতে দিতুম না। শিক্ষার ভার কর্পোরেশন নিয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি শিক্ষা থেকে কেউ বঞ্চিত থাকে তবে খবরের কাগজে চিঠি লেখা যেতে পারে। স্বাস্থ্যের ভারও তো কর্পোরেশনের। ট্যাক্স দিচ্ছি। তাই যথেষ্ট নয় কি? মাসিমা আমার যুক্তি শুনে পরম আপ্যায়িত হন। আর আমাকেও আপ্যায়ন যা করেন তাও চরম।

কিন্তু মালার সামনে আমার মুখ ফোটে না। সে বেচারি একেবারে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো নিষ্ক্রিয়। কত রকম পক্ষাঘাত আছে। এও একরকম। সে চায় দুর্গম পথে যাত্রা করতে। সুগম পথ আর যারই জন্যে হোক মালার জন্যে নয়। সে চায় ওই পথের শেষে মুক্তা ঝরার কূলে পৌঁছতে। সে চায় বাঁচাতে। এক একটি দুর্গম পথের দিকে পা বাড়ায়। আর অমনি তার মা এসে তার পথ আগলে দাঁড়ান। সে নজরবন্দী। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে নয়। সে যদি ইচ্ছা করে ভদ্র ঘরের মেয়েদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে রেস্‌পেক্‌টেবল কাজ করতে পারে। মালার অভিরুচি সেদিকে নয়। যা হোক একটা কিছু করতে হবে এ মনোভাব তার নয়।

আমি চুপ করে বসে আছি দেখে মালা বলে, "কারো

বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই, দেবুদা। কোনো খেদও নেই আমার মনে।"

"তা হলে তো কোনো কথাই ওঠে না।" আমি বলি, "তা হলে তো সব ঠিক আছে।"

কথাবার্তা এর বেশী এগোয় না। আমি ভাবতে থাকি। মালা বলে, "মা যা করতে বারণ করেছেন তা করতে আমিও যে এমন কিছু অধীর হয়ে উঠেছি তা নয়। আমাকে অধীর করে তোলা সহজ নয়। আমি স্বভাবতই ধীর।"

"সে আমি জানি। তোমার ধৈর্যের সীমা নেই।" আমি তার প্রশংসা করি। বাস্তবিক তার প্রশংসা না করে পারিনে। কবে থেকে সে স্বপ্ন দেখছে কিরণমালার মতো। স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারার দুঃখ আমি বুঝি।

"ধৈর্য অসীম হলে কি মা'র সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়? আমি লজ্জিত।" সে আমার কাছে অনুশোচনা প্রকাশ করে। "মা যে আমার ভালোর জন্যেই চিন্তিত তা কি আমি বুঝিনে?"

এর কিছুদিন পরে টোগো এসে হাজির। দারুণ উত্তেজিত। কী একটা বলতে চায়, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরয় না।

"কী হয়েছে, টোগো?" আমি তাকে ধরে নাড়া দিই।

"সর্বনাশ!" সে এক কথায় সারে।

"সর্বনাশ! কার সর্বনাশ! কেমন সর্বনাশ!" আমি বিমূঢ় হয়ে বলি। যত রকম সর্বনাশ হতে পারে তার মিছিল দেখতে থাকি কল্পনার চোখে।

"মিউটিনি !" সে ধপ করে বসে পড়ে।

"মিউটিনি !" আমি আতঙ্কিত হই। কিন্তু সে আতঙ্ক অবিমিশ্র নয়। আনন্দমিশ্রিত। বাধল তা হলে আর একবার সিপাহীযুদ্ধ। এবার ইংরেজ সামলাতে পারলে হয়।

টোগো আরো পরিষ্কার করে বলে, "নেভাল মিউটিনি। বম্বেতে, করাচীতে গুলী বিনিময় চলেছে। ভাগ্যিস আমি ওর মধ্যে নেই।"

আমি তামাশা করে বলি, "বা! এত বড় একটা অ্যাডভেঞ্চার তোমার বিদ্যমানে ঘটল না, এর জন্যে তোমার আফসোস নেই ?"

টোগো দার্শনিকের মতো বলে, "তোমার বোনের দিকটাও একবার ভেবে দেখতে হয়। বাবা! অ্যাকশনে মরতে আমি যে কোনোদিন তৈরি ছিলুম। কিন্তু কোর্ট মার্শালের হুকুম শুনলেই আমার হার্টফেল করত। আহা, এই হতভাগারা জানে না এদের কপালে কী আছে! আমি জানি, তাই আমার বুক কাঁপছে।"

কথাটা সত্যি। নেভাল মিউটিনি ইংরেজরা অনায়াসেই দমন করতে পারবে। একমাত্র ভরসা যদি এয়ার ফোর্সে ও আর্মিতে ছড়ায়।

যা ভেবেছিলুম এয়ার ফোর্সেও ছড়াল। কিন্তু তার আগেই নেভির আগুন নিবেছিল। তেমনি এয়ার ফোর্সের আগুনও নিবল। আমি যে টোগোর মতো নিশ্চিন্ত হলুম তা নয়।

আমার মনে হলো ভারতবর্ষ একটা ঐতিহাসিক সুযোগ হারালো।

কিন্তু এসব ঘটনা ব্যর্থ হলো না। ক্যাবিনেট মিশন এলো নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে। আসর জমে উঠল রাজনীতিবিশারদদের। সেসব কূটতর্ক আমার মতো অব্যবসায়ীর বোধগম্য নয়। টোগো যদিও সাংবাদিকতা ছেড়ে জাহাজের কারবারে ভিড়েছে তবু প্রত্যেকটি রাজনৈতিক চালের সন্ধান রাখে ও অর্থ বোঝে। দেখা হলেই আমাকে শোনায়।

"জিন্না ভেবেছিলেন ইংরেজ তাঁর ডামি হয়ে ব্রিজ খেলতে বসেছে।" টোগো রসিয়ে রসিয়ে বলে, "এ, বাবা, সে ইংরেজ নয়।"

আমি জানতুম না যে ইংরেজ এতদিন ডামি হয়ে খেলছিল। অজ্ঞতা ঢেকে বলি, "তাই তো! ইংরেজ কবে থেকে এমন লায়েক হলো!"

"ওরা এতকাল পরে নির্ঘাত সমঝেছে", টোগো সবজান্তার মতো বলে, "নেহরুকে চটালে মিউটিনি। জিন্নাকে চটালে তেমন কিছু নয়। জোর একটু দাঙ্গাহাঙ্গামা। তাও ইংরেজের গা বাঁচিয়ে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি," সে আমাকে বিশ্বাস করে বলে খবরের কাগজের ভাষায়, "ক্যাবিনেট মিশন নিষ্ফল হলেও নেহরুকেই আহ্বান করা হবে তাঁর নিজের পছন্দমতো গভর্নমেণ্ট গঠন করতে।"

ফ্রান্সে আমি তিন মাস অন্তর অন্তর গভর্নমেণ্ট গঠনের দৃশ্য দেখেছি। তাই একটু রগড় করে বলি, "ক'মাসের জন্যে ?"

টোগো আমার উপর খাপ্‌পা হয়। "তুমি কিস্‌সু বোঝো না, দেবপ্রিয়। ক্ষমতা আমাদের হাতে আসছে কে জানে ক'শতাব্দী পরে। এই প্রথম আমরা দিল্লী থেকে গভর্নমেণ্ট চালাব বাঙালী বিহারী গুজরাতী মরাঠা পাঞ্জাবী মাদ্রাজী হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রীস্টান মিলে। আঃ! কত কালের কত বড় একটা স্বপ্ন সফল হতে চলল। হায়, রবীন্দ্রনাথ! তুমি কেন বেঁচে রইলে না আরো কয়েকটা বছর! গুরু হে, তুমিই সত্য।"

এই বলে সে গুনগুনিয়ে ওঠে, "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা।"

আমার হৃদয়েও দোলা লাগে। বলি, "মহাভারত পড়েছ নিশ্চয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগ দিতে এসেছিল সারা ভারতবর্ষ। গান্ধার, মদ্র, বাহ্লীক, সিন্ধু, পাঞ্চাল, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুণ্ড্র, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মালব, অন্ধ্র, দ্রাবিড়, সিংহল, কাশ্মীর। সেকালের ভারতবর্ষ একালের চেয়েও বৃহত্তর ছিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ দেখে কেই বা সেদিন কল্পনা করেছিল যে এর পরে আসছে কুরুক্ষেত্র ? কেন ও রকম হলো ? হলো এইজন্যে যে যুধিষ্ঠিরের যাতে হর্ষ দুর্যোধনের তাতে বিষাদ। আর দুর্যোধনের শিবিরটিও কম যায় না।"

টোগো ফুৎকার দেয়। "তুমি বলতে চাও আর একটা কুরুক্ষেত্র বাধবে।"

"অসম্ভব নয়, যদি যুধিষ্ঠির তাঁর ভাই দুর্যোধনকে ভালোবাসা দিয়ে জয় না করে বুদ্ধি দিয়ে চালমাৎ করতে যান। বুদ্ধির খেলায় হেরে গেলে লোকে বাহুবলের পরীক্ষা চায়। বিনা যুদ্ধে হার মেনে নেয় না।" আমি গম্ভীরভাবে বলি।

"তুমি এসব বিষয়ের কিস্সু বোঝো না। একদম আনাড়ি।" টোগো হেসে উড়িয়ে দেয়। "রাজনীতির খেলায় চালমাৎ হলেই অমনি যুদ্ধ বেধে যায় না। আর বাধলেই বা কী? আমরাই বাহুবলে শ্রেষ্ঠ।"

"আমরা" কথাটা আমার কানে খট করে বাজে। একরকম গুলীর আওয়াজ। আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করি, "তোমার ওই 'আমরা' কথাটার মানে কী?"

টোগো ঘাবড়ে গিয়ে বলে, "কেন? আমরা! মানে হিন্দুরা।" তার পরে শুধরে দিতে গিয়ে বলে, "হিন্দুরা আর শিখেরা আর জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা। যাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়েছিলেন নেতাজী। আহা, নেতাজী! তুমিই সত্য।"

এমন মানুষের সঙ্গে তর্ক করবে কে? আমি ভঙ্গ দিই। মনটা হায় হায় করে ওঠে। কী যে আছে দেশের কপালে! সবাই মিলে বিদেশী শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করা এক কথা। সবাই মিলে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। তখন 'সবাই' আর সবাই থাকে না। ধর্মের টানে বা রক্তের টানে একপক্ষের সৈনিক অপর পক্ষে চলে যায়। ওই আজাদ

হিন্দ ফৌজকে যদি বলা হতো জিন্নার দলের বিদ্রোহ দমন করতে ফৌজ দু'ভাগ হয়ে যেতো। সংহতিনাশ অনিবার্য। জাতীয়তাবাদী সেন্টিমেণ্ট বাইরের লোকের বিরুদ্ধে জাগানো যায়। ঘরের লোকের বিরুদ্ধে নয়। তখন যা স্বভাবত জাগে তা হিন্দু বা মুসলিম সেন্টিমেণ্ট।

জিন্না এ রহস্য সকলের চেয়ে বেশী বুঝতেন। কারণ একদা তিনি নিজেই একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ছিলেন। নেহরু গভর্নমেণ্ট গড়তে গিয়ে সৌজন্যবশত জিন্নার সহযোগিতা চাইলেন। জিন্না প্রত্যাখ্যান করলেন। নেহরু দিল্লীর মসনদে বসবার আগেই শুরু হয়ে গেল ওস্তাদের মার। ডাইরেক্ট অ্যাকশন।

উঃ! সে কী পৈশাচিক কাণ্ড! সশস্ত্র পুরুষের সঙ্গে সশস্ত্র পুরুষের বলপরীক্ষা নয়। যুদ্ধ বলতে যা বোঝায়। এমন কি ওকে দাঙ্গা বললেও ভুল বলা হয়। দাঙ্গাও তো সবলের সঙ্গে সবলের, সশস্ত্রের সঙ্গে সশস্ত্রের। ফরাসীদের ইতিহাসে পড়েছি একদা সেদেশে ঘটেছিল সেণ্ট বার্থোলোমিউ দিবসের ম্যাসাকার। ক্যাথলিকরা দলবদ্ধভাবে চড়াও হয়ে বা ঘেরাও করে নিরীহ প্রোটেস্টাণ্টদের নির্বিচারে নিকাশ করে। প্ররোচনা দিয়েছিলেন স্বয়ং কাথারিন ছ মেদিসি। প্রবল পরাক্রান্ত রাজমাতা। রাজ্যের প্রকৃত শাসক। কারণটা ধর্মগত নয়, রাজনীতিগত। ষোড়শ শতাব্দীর সেই ফরাসী পৈশাচিকতা দেশকাল অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর ভারতে

উপনীত দেখে আমি তো বেবাক দিশেহারা। গরীব দুঃখী পথচারী, নারী ও শিশু হয়েছে তাদের শিকার।

দেখলুম প্রোটেস্টান্টরাও কিছু কম যায় না। অবিকল একই রকম শিকারপদ্ধতি ও শিকারীপনা। কে কাকে শেখাবে? খুন চেপে গেছে মাথায়। রক্তের বদলে রক্ত। মাংসের বদলে মাংস। না, মাংস সম্বন্ধে আমি অতটা নিশ্চিত নই। তবে একেবারেই যে নিরামিষ ব্যাপার তা বিশ্বাস করা শক্ত।

টোগো একদিন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলে, "কী করে উদ্ধার করা যায়, বল তো?"

আমি চমকে উঠে বলি, "কাকে?"

"মালাকে ও তার মা বাবাকে।" সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "ওঁদের পার্ক সার্কাসের বাড়ীটা পড়েছে মুসলিম পকেটে। ওখানে পুলিশ পর্যন্ত যেতে ভয় পায়। ভলান্টিয়াররা ভয়ে ঘেঁষতে চায় না। আমি একা কী করতে পারি!"

আমি ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকি। মালা! মালার মা বাবা! হা ঈশ্বর! কোনো মতে বলি, "ওঁরা বেঁচে আছেন ঠিক জানো?"

"ঠিক জানি। অন্তত আধ ঘণ্টা আগেও বেঁচেছিলেন।" টোগো আমার অশান্ত অন্তরে যা ছিটিয়ে দিল তা শান্তিজল নয়।

"তা হলে চল যাই উপায় দেখি।" আমি তৎক্ষণাৎ তৈরি হয়ে নিই।

পথে যেতে যেতে শুনি মেসোমশায়দের বাড়ীর চার দিকে গুণ্ডারা হানা দিচ্ছে। ভিতরে ঢুকতে পারেনি, তার কারণ

মাসিমা পশ্চিম থেকে গুটি দুই হিন্দুস্থানী ঠাকুর চাকর এনেছিলেন, তারা লুচি বেলতে ততটা সিদ্ধহস্ত নয় লাঠি চালাতে যতটা। কিন্তু তারাও তো মনিবকে ছেড়ে বাইরে গিয়ে খবর দিতে পারছে না। খবরটা তা হলে দেবে কে? বাড়ীতে টেলিফোন নেওয়া হয়নি। ডাকপিয়নও যায় না, যেতে সাহস পায় না। মুসলমান দরজি গেছল জামার ডেলিভারি দিতে। তাকেও ঢুকতে দেয়নি। কিন্তু লোকটা ধর্মভীরু। মেসোমশায়কে ভক্তি করত। সে তার নিজের বুদ্ধিতে এইটুকু করেছে যে ব্রাইট স্ট্রীট পর্যন্ত হেঁটে এসে তার আরেক জন খদ্দেরকে অর্থাৎ টোগোকে খবরটা দিয়েছে। হাঁ, সবাই বেঁচে আছেন।

গভর্নমেণ্ট হাউসে আমার যাতায়াত ছিল। নতুন গভর্নর আমাকে চেনেন না, কিন্তু এঁর আগে যিনি ছিলেন তিনি চিনতেন। কারণ তিনি ছবি চিনতেন। সেইসূত্রে স্টাফের সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল। সশরীরে হাজির হয়ে আমার কার্ড পাঠিয়ে দিই। মিলিটারি সেক্রেটারি আমাকে দর্শন দিলেন। আমার জন্যে তিনি কী করতে পারেন? করতে পারেন আমার স্বজনদের উদ্ধার কার্যে সাহায্য।

চললুম আমি সরকারী গাড়ীতে করে গোরা সার্জেণ্টের সঙ্গে পার্ক সার্কাস। আমাকে দেখে যারা মারতে আসত গোরাকে দেখে তারা বিনা বাক্যে অন্তর্ধান। সাদা চামড়ার প্রেসটিজ কত! আমি তো লজ্জায় মরি। অন্য সময় হলে কখনো ওদের সাহায্য নিতুম না। কিন্তু এ হলো একটি পরিবারের

জীবনমরণ সমস্যা। বলা বাহুল্য টোগোও ছিল আমার সঙ্গে। সে না থাকলে সার্জেণ্টের সঙ্গে চাল দেবে কে? সার্জেণ্ট তাকে 'সার' বলছিল।

মাসিমা আমাদের দু'জনকে দেখে কেঁদে ফেললেন। আর মেসোমশায় এমন এক হাসি হাসলেন যা কেবল সাধুসন্তেরা পারেন। মালা যেন রূপকথার রাজ্যে বাস করছে। সে তার স্বপ্নের ঘোরে বলে, "অরুণ, বরুণ, তোমরা বেঁচে আছো তো? পাথর হয়ে যাওনি তো?"

টোগো আমাকে এক ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে বলে, "পাগলামির পূর্বলক্ষণ।"

আমি বলি, "না। থাক, তুমি বুঝবে না।"

বাড়ী রইল ঠাকুর চাকরের পাহারায়। মালীটি মুসলমান। সে তার স্বধর্মীদের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। গোরা সার্জেণ্টকে দেখে তারও বুকে সাহস জাগল। সেও পাহারা দেবে। মাসিমা অবিশ্বাস করছিলেন, আমি তাঁকে অভয় দিয়ে পাড়ার লোককে ডাক দিয়ে বললুম, "ভালো করে দেখে নাও, গাড়ীখানা লাটসাহেবের বাড়ীর।"

এন্তার সেলাম কুড়োতে কুড়োতে মাসিমাদের তিনজনকে নিয়ে ব্রাইট স্ট্রীটে নীলির হাতে গছিয়ে দিলুম। এটা টোগোদের পৈত্রিক ভদ্রাসন নয়। তার কোম্পানী তাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। বন্দুকধারী দারোয়ান ছিল। তাকে দেখে মাসিমার প্রত্যয় হলো যে গুণ্ডাশাহীর দাপট অতদূর

পৌঁছবে না। তিনি আরো একবার কেঁদে ফেললেন। টোগোর সঙ্গে মালার বিয়ে কেন হলো না তাই ভেবে বোধ হয়।

সার্জেণ্টকে ও শোফারকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দেওয়া হলো। না, শুধু ধন্যবাদে চিঁড়ে ভেজে না। গলা যাতে ভেজে এমন দ্রব্যও টোগো তার সেলার থেকে বার করে গোপনে পাচার করে দিল বাড়ী থেকে গাড়ীতে।

মেসোমশায়কে কখনো গান করতে শুনিনি। স্থানকালপাত্র ভুলে তিনি গান ধরলেন, "সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।"

গান শেষ হলে আপন মনে বলতে লাগলেন, "গেল! গেল! এই তিনটি দিনে নিঃশেষ হয়ে গেল তোমার পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার অভিমান! তোমার মহত্ত্বের দম্ভ! তোমার সিন্থেসিসের বড়াই! তোমার গুরুগিরির দর্প!"

তার পর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, "গো অ্যাণ্ড রিপেণ্ট। যাও। অনুতাপ কর। প্রায়শ্চিত্ত কর। তপস্যা কর। চুপ চুপ। একটি কথাও না। হিন্দু করেনি, মুসলমান করেছে শুনতে চাইনে এ কথা। কে হিন্দু? কে মুসলমান? একই চেহারা। একই অপরাধ। কে ফরিয়াদী? কে আসামী? গো অ্যাণ্ড রিপেণ্ট। যাও, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।"

আমরা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। তখন তিনি একটু শান্ত হলেন। তিন দিন তাঁর নিদ্রা হয়নি। কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

সাত

কেবল কলকাতার উপর নয়, সারা দেশের উপর নেমে এলো জার্মান পুরাণের কালরাত্রি Walpurgis Night. সাত শ' বছরের বাসি মড়ারা কবর থেকে বা শ্মশান থেকে উঠে এলো। উঠে এসে লড়াই যেখানে থেমেছিল সেইখান থেকে আবার শুরু করে দিল। কবেকার কোন্ যুদ্ধের পুনরভিনয়। বোধ হয় প্রথম পাণিপথের যুদ্ধের। ভূতের সঙ্গে ভূতের রণ।

রাত যেন আর পোহাতেই চায় না। যেন বারো ঘণ্টার রাত নয়। বারো মাসের রাত। কালরাত্রি ভোর হলো। মামদো আর ব্রহ্মদৈত্য কবরে আর শ্মশানে ফিরে গেল। অবাক হয়ে দেখি দেশ ভেঙে গেছে। প্রদেশ ভেঙে গেছে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই চুড়িওয়ালার মতো আমিও ভাঙা বুকের মধ্য হতে ডুকরিয়ে কেঁদে উঠে তুই হাতে চোখ চেপে ধরে বলে উঠলুম, "মারে, এ মুই কী দ্যাখলাম! অ্যার আগে মুই মল্যাম না ক্যান!"

কিন্তু থাক সে কথা। বলব আমি যথাক্রমে। যখনকার কথা তখন।

"মহৎ কলিকাতা হত্যাকাণ্ডে"র সময় আমার অন্তর্জীবনে একটা সঙ্কট চলেছে। তাই নিয়ে আমি অন্যমনস্ক। শিল্পী

ব্যতীত আর কেউ বুঝবে না, আর কাউকে বোঝানো যাবে না সঙ্কট কিসের আর কেনই বা সঙ্কট। ওই যে শিমূলগাছটা দেখছ ওটা আছে। ওর অস্তিত্বের জন্যে ওকে জবাবদিহি করতে হয় না, ব্যাখ্যা করে বলতে হয় না কী ওর তাৎপর্য। ওটা যে বট নয়, অশথ নয়, শিমূল এটাও স্বতঃসিদ্ধ। যার চোখ আছে সে-ই চিনতে পারে ওটা শিমূল। ঘটা করে চেনাতে হয় না। তেমনি কুতব মিনার বা তাজমহল বা পুরীর মন্দির দেখে প্রশ্ন ওঠে না, কেন এটা আছে। কী এর মানে। কোন্‌খানে এর বৈশিষ্ট্য। অত কথায় উত্তর দিতে হয় না। এক কথায় বলতে পারা যায়, "দ্যাখ।"

শিল্পকর্ম নিছক অস্তিত্বের দ্বারা আপনাকে আপনি প্রচার করে। তার প্রকাশটাই তার প্রচার। অথচ যত প্রচার আমাদের ছবির বেলা। প্রচার না করলে তো গেলে। দর্শক বা ক্রেতাদের বোঝাতে বোঝাতে আমরা হদ্দ হয়ে যাই যে এটিও একটি অস্তিত্ব। এটি আছে বলেই আছে। আছে যখন তখন একটা মাথামুণ্ডু আছে বইকি। কী ওর মানে সেটা তো কেউ কুতব মিনারকে বা তাজমহলকে সুধায় না। চেনাও কঠিন নয় কোন্‌টা তাজমহল আর কোনটা মোতি মসজিদ। তা হলে আমাকে অত কথায় বোঝাতে হয় কেন? দর্শক ও ক্রেতাদের উপর আমি রাগ করেছি। রাগ করে ছবি আঁকা ছেড়ে দেব কি না ভেবেছি। যখনকার কথা

বলছি তখন অন্যমনস্ক হয়ে চিন্তা করছি কেমন করে ছবি আঁকলে কেউ আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে না! চাইবে ছবির কাছে। ছবিই বলবে, কেন সে আছে, কী তার মানে। হাঁ, ছবি সত্যি সত্যি বলবে। বলবে ছবির ভাষায়। সে ভাষা যারা জানে না তারাও বুঝবে যে কিছু একটা বলা হচ্ছে কী একটা অজানা ভাষায়। ভাষাটা একবার যত্ন করে শিখে নিলে ছবিটা আর দুর্বোধ্য নয়। বরং একান্ত সহজবোধ্য। সেটুকু যত্ন যারা করবে তারা লাভ করবে অমূল্য উপভোগ। রূপভোগ।

এইসব ভাবনা নিয়ে আমি অন্যমনস্ক। এমন সময় ঘটে গেল "মহৎ কলিকাতা হত্যাকাণ্ড।" সভ্য সমাজে বাস করে যথেচ্ছ খুন জখম করে যাও, সাজা হবে না। বরং বীর বলে বন্দনা পাবে। যুদ্ধে তবু প্রাণ নিতে গেলে প্রাণ দিতে হয়। এক্ষেত্রে প্রাণ দেবার বালাই নেই। আততায়ীরা প্রত্যেকেই জীবিত। পুলিশের সঙ্গে, পলিটি-সিয়ানদের সঙ্গে তলে তলে যোগ আছে। প্রাণ দেবে সশস্ত্র বলবান আততায়ী নয়, নিরস্ত্র নিরীহ পথচারী। ডিমওয়ালা, চানাচুরওয়ালা, মুচি, ধাঙ্গড়। একবেলা বাইরে না বেরোলে যাদের পেট চলে না। সমগ্র সমাজকে কাঁধে করে চলেছে যারা। সভ্যতার বোঝা যাদের পিঠে চেপেছে। হায়! হায়! মরবে কি না এরাই!

মরতেই হবে! না মরে উপায় আছে? সংখ্যা মিলবে

কী করে? রাত্রে হিশাব করা হয় আজ কলকাতা শহরে ক'জন হিন্দু আর ক'জন মুসলমান নিকাশ হলো। হিশাবে হিন্দু কম ও মুসলমান বেশী হলে পরের দিন বেশী হিন্দু ও কম মুসলমান মরা চাই। বাঁদরের পিঠেভাগের মতো দুই পাল্লা সমান রাখতে প্রাণান্ত। কথা নেই, বার্তা নেই, অজানা একটা লোক হঠাৎ কোন্‌খান থেকে বেরিয়ে এসে ধাঁ করে আর একটি অজানা লোকের বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কেন? আগে থেকে শত্রুতা আছে? না, শত্রুতা নেই। তবে কিসের জন্যে এ আক্রমণ? অর্থের জন্যে? না, তাও নয়। হিশাব মেলাতে হবে। হিন্দুর বদলে হিন্দু। মুসলমানের বদলে মুসলমান। চোখের বদলে চোখ। দাঁতের বদলে দাঁত। আজ যদি সাতটি হিন্দু কম পড়ে কাল যাকে পাবে তাকে মারতেই হবে, নাই বা থাকল তার কোনো দোষ। তেমনি কাল যদি পাঁচটি মুসলমান কম পড়ে তবে পরশু যেমন যেমন করে হোক পূরণ করতেই হবে, নয়তো মান থাকে না, মারণের খেলায় হার হয়।

কাজটা যে গর্হিত সকলেই তা জানে। তবু বিবেককে এই বলে বুঝ দেয় যে, ওকে না মারলে ও-ই হয়তো একদিন মারত। কিন্তু ও যে গরিব ফেরিওয়ালা! রেখে দিন, মশায়, গরিব ফেরিওয়ালা! সাপ, সাপ, সাক্ষাৎ কালসাপ। সাপের শেষ রাখতে নেই। সাপের সঙ্গে বাস করা যায়

না। সুযোগ পেলেই কাটবে। এ পাড়াকে আমরা সাপের কামড় থেকে বাঁচাতে চাই। তাই একধার থেকে সাপের বংশ সাবাড় করে আনছি। বাধা যদি দেন তো আপনাকেও—। আমি পিট্টান দিই।

মেসোমশায় দিন কতক পরে প্রকৃতিস্থ হন। কথা বেশী বলেন না। মৌন থাকেন। কী যেন ধ্যান করছেন। একদিন আমাকে পাশে বসিয়ে বলেন, "প্রেমের বড় অভাব।"

আমি তাঁকে বলতে দিই। বাক্যক্ষেপ করিনে।

"আমি যেন দেউলে হয়ে গেছি। ভালোবাসতে চাই। ভালোবাসতে পারছিনে। কোনো মতে ঘৃণাকে ঠেকিয়ে রাখছি। ক্রোধকে পথ ছেড়ে দিচ্ছিনে। আরুণির মতো আমিও আলের বাঁধ বাঁধছি। কিছুতেই আল বাঁধতে না পেরে শুয়ে পড়ে শরীর দিয়ে ছিদ্র নিরোধ করছি। জলের তোড়ে ভেসে যাইনি এখনো। প্রাণপণে স্থির থাকছি।" বলতে বলতে তিনি ঘেমে ওঠেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে যদিও।

তাঁর অন্তরে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল। দেবাসুরের দ্বন্দ্ব। ঘৃণাসুরের সঙ্গে, ক্রোধাসুরের সঙ্গে প্রেমদেবতার দ্বন্দ্ব, কল্যাণদেবতার দ্বন্দ্ব। বাইরে যেমন হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বে নিরীহ শিকার কম পড়ছিল অন্তরে তেমনি প্রেম কম পড়ছিল, কল্যাণ কম পড়ছিল। বাইরে কম পড়লে পুষিয়ে দেবার উপায় ছিল। অন্তরে কিন্তু তেমন নয়। প্রেমের

বড় অভাব। প্রেম পারছে না অপ্রেমের সঙ্গে পাল্লা সমান রাখতে।. প্রেম হেরে যাচ্ছে।

অন্তর অন্বেষণ করে দেখি আমিও তেমনি দেউলে হয়ে গেছি। আমি কাপুরুষ। নিরীহ শিকারকে বাঁচাতে যাইনে, পাছে শিকারীদের কোপে পড়ে প্রাণ হারাই। মরব কী করে? আমার হাতে যে অসমাপ্ত কাজ। আধখানা ছবি শেষ করবে কে?

মেসোমশায়কে বলি, "আজকের দিনে প্রেমের মতো বিপজ্জনক আর কী আছে? রাস্তায় বেরোতে হয় আমাকে। চোখ বুজে পথ চলতে পারিনে। যা চোখে পড়ে তা আমার পৌরুষকে লজ্জা দেয়। মনুষ্যত্বকে লজ্জা দেয়। প্রেম আমাকে ঠেলা দিয়ে বলে, লোকটাকে বাঁচাও। ওকে বাঁচানো মানে আপন মনুষ্যত্বকে বাঁচানো, পৌরুষকে বাঁচানো। আমি কি তার কথা শুনি! আমি বলি, ওটা পুলিশের কাজ। রাষ্ট্রের কাজ। আমার কাজ ছবি আঁকা।"

বেশ বুঝি যে আমার মনুষ্যত্বে টান পড়ছে, পৌরুষে টান পড়ছে। প্রেমের কথা যদি না শুনি তবে প্রেমেরও অভাব হয়। মেসোমশায়ের মতো আমারও দশা। আমিও ভালোবাসতে চাই। কিন্তু ভালোবাসতে পারছিনে। কিন্তু অন্য অর্থে। আমার অন্তরের দ্বন্দ্ব অপ্রেমের সঙ্গে প্রেমের নয়, অক্ষমতার সঙ্গে প্রেমের। কাপুরুষতার সঙ্গে প্রেমের।

এসব সমস্যা সমস্যাই নয় আমার প্রতিবেশী ডক্টর

পাকড়াশির কাছে। এই বিদ্বান একদিন আমাকে প্রশ্ন করেন, "ওহে আর্টিস্ট, তুমি তো পড়াশুনোও করেছ শুনেছি।. বলতে পারো ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কত ?"

আহা, কে না জানে যে চল্লিশ কোটি! আমার উত্তর শুনে ভদ্রলোক বলেন, "বেশ। এখন হিন্দুর সংখ্যা কত ?"

একটু বিরক্ত হয়ে বলি, "ত্রিশ কোটি।" তা শুনে তিনি থামবার পাত্র নন। জানতে চান মুসলমানের সংখ্যা কত। বলি, "দশ কোটি।"

"তা হলে," ভদ্রলোক অদম্য, "এবার বল দেখি দশ কোটি হিন্দু যদি মরে বাকী থাকে কত আর দশ কোটি মুসলমান যদি মরে কত বাকী থাকে।"

আমি তো চিত্তির! মাথা চুলকাই। ভদ্রলোক তা দেখে এক গাল হেসে বলেন, "আরে! অত ভাববার কী আছে! ও তো সোজা অঙ্ক। এ পক্ষে দশ কোটি যদি মরে ষষ্ঠীর কোলে আরো বিশ কোটি বেঁচে থাকে। আর ও পক্ষে দশ কোটি যদি মরে একটিও বেঁচে থাকে না। হিন্দুস্থান সাফ হয়ে যায়। অবশ্য জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়, উপায় নেই। সর্বনাশং সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।"

হাঁ। তিনি একজন পণ্ডিত। আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিই যে আরম্ভটা যখন বাংলাদেশে হয়েছে তখন বাঙালীর সংখ্যাই প্রাসঙ্গিক। এ পক্ষে তিন কোটি আর ও পক্ষে তিন কোটি যদি মরে তা হলে বাঙালী হিন্দু বলতে একজনও

বেঁচে থাকে না, অথচ বাঙালী মুসলমান বলতে বেঁচে থাকে আধ কোটি। তখন তামাম বাংলাদেশটাই পাকিস্তান।

এবার তিনিই চিত্তির। আমিও অনেক দুঃখে হাসি। "কেন? এ তো সোজা অঙ্ক। আর ওরাও তো কম পণ্ডিত নয়। অর্ধেক কেন, বারো আনা ছাড়তেও রাজী।"

এইসব মাথা খারাপের দল একদিন গায়ের চামড়া বাঁচাবার জন্যে বাংলার দশ আনা ত্যাগ করবে তা কি তখন আমি কল্পনা করতে পেরেছি? দিল আমাকে এমন এক বিস্ময়ের ধাক্কা যা আমি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এরা মরবেও না, বাঁচবেও না, আধ-মরা আর আধ-বাঁচা হয়ে ত্রিশঙ্কুর মতো ইতিহাসের শূন্যে ঝুলে থাকবে।

মাসিমা ঠাউরেছিলেন এ গোলমাল দু'দিন বাদেই থেমে যাবে। মাথার উপর ইংরেজ থাকতে ভাবনা কী? অন্যান্য বারের মতো আমাদের সমঝিয়ে দেবে যে ওরা ভিন্ন আর গতি নেই। সাপুড়ে যেমন সাপকে ডালা থেকে বার করে নাচায়, তার পর আবার ডালায় ভরে তেমনি দাঙ্গাবাজদের খেলতে দিয়ে শ্রীঘরে পূরবে। ইংরেজের উপর যদিও তাঁর ভীষণ রাগ—ইতিমধ্যে তিনি নেতাজীর ভক্ত হয়েছেন—তবু তাঁর অন্তিম ভরসা ওই ইংরেজই। আমাকে বলেন, "ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। তুমি দেখবে, দেবপ্রিয়, একদিন এক চড়ে ঠাণ্ডা করে দেবে। ওরা কি সত্যি যাচ্ছে?"

কে যে ওস্তাদ সেবিষয়ে মতভেদ ছিল। মাসিমার মতে

ইংরেজ। আমার সর্বত্যাগী বন্ধু উৎপলের মতে গান্ধীজী। সে বলে "দেখিস তোরা, দেখিস। আর সবাই যখন ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দেবেন, মহাত্মাজী তখন হাল হাতে নেবেন। মিরাক্‌লের দিন যায়নি রে। মিরাক্‌লের দিন আসছে। আজ যাদের দেখা যাচ্ছে খুনোখুনি করতে সেদিন তাদের দেখা যাবে কোলাকুলি করতে।"

অবশ্য বেঁচে থাকলে। উৎপল শুনলে মর্মাহত হবে, তাই মুখ ফুটে বলিনে। আমার নিজের মতে ওস্তাদ যদি কাউকে বলতে হয় তবে জিন্নাকে। বিরোধটা গোড়ায় ছিল জাতীয়তা-বাদীদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের। কিন্তু কায়দে আজম আজ এমন বেকায়দায় ফেলেছেন যে জাতীয়তাবাদীদেরও গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে সাম্প্রদায়িক রা। ঠিক যেমনটি ওস্তাদজী চেয়েছেন। কথায় না হোক কাজে তো প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে হিন্দুরা এক নেশন, মুসলমানরা আর এক নেশন। কিংবা নেশন কোনো পক্ষই নয়, দুই পক্ষই সম্প্রদায়। শুধু ইংরেজের সঙ্গে লড়বার সময় ভারতীয়। সে লড়াই তো এখন চুকে গেছে। দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন জবাহরলাল। বড়লাটের যুবরাজ।

একদিন মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন রাজেক হোসেন চৌধুরী। পার্ক সার্কাসে তাঁর প্রতিবেশী। জানতুম না যে একদা তিনি মেসোমশায়ের সহপাঠী ছিলেন। আর ছিলেন স্বদেশীযুগের সহকর্মী। বয়সে কিছু বড়, তাই

মেসোমশায় তাঁকে ডাকতেন "রাজেকদা" বলে। রাজেকদা থেকে রাজেনদা। এই নামটাই পরে চল হয়ে যায়। রাজেক হোসেনরা হুগলী জেলার খানদানী বংশ। আচারে ব্যবহারে হাফ হিন্দু। তাঁদের বাড়ীতে গোমাংস ঢুকত না। তাঁদের আলাদা একটা অতিথিশালা ছিল হিন্দুদের জন্যে। সেখানে বামুন রাঁধত। মেসোমশায়ও সেখানে অতিথি হয়েছেন স্বদেশীযুগে।

বঙ্গভঙ্গের জন্যে রাজেক হোসেনও বিপদ বরণ করেছিলেন। আন্দোলনটা ক্রমেই হিন্দু হয়ে উঠছে দেখে পশ্চাতে সরে যান। বলেন, স্বদেশী মানে কি স্বধর্মী? তাই যদি হয় তবে মুসলমানেরও তো স্বধর্ম আছে। সে কেমন করে অংশ নেবে? তাকে তা হলে স্বতন্ত্র ভাবে লড়তে হয়। ইংরেজের সঙ্গে। কী করে তা সে পারবে যদি বেশীর ভাগ স্বধর্মী উদাসীন হয় কিংবা ইংরেজের পক্ষে দাঁড়ায়? রাজেক হোসেন মনের দুঃখে নির্বাসনে যান। স্বয়ংবৃত নির্বাসন। অনেক দিন পরে আবার তাঁকে নামতে দেখা গেল অসহযোগ তথা খেলাফৎ আন্দোলনে। স্বদেশের সঙ্গে স্বধর্মকে একসূত্রে গেঁথে তিনি তাঁর দেশপ্রেম তথা ধর্মনিষ্ঠা একসঙ্গে চরিতার্থ করেন। জেলে যান। জেল থেকে ফিরে একটু একটু করে আবার সরে যান পিছনে।

লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি যোগ দেননি। জিজ্ঞাসা করলে বলেছেন, একসঙ্গে লড়তে হলে

একসূত্রে গাঁথতে হয়। তেমন সূত্র কই? লড়তে যে আমার অনিচ্ছা তা নয়। কিন্তু একসঙ্গে লড়া অসম্ভব। যদি কোনো দিন লড়ি তো আলাদা লড়ব। ইংরেজ আমারও শত্রু। আর লড়তে আমিও জানি।

এর বছর সাতেক পরে দেখা গেল তাঁদের দেউড়ির দু'দিকে দণ্ডায়মান দুই সিংহের মূর্তি অপসারিত হয়েছে। ব্রিটিশ সিংহের অপসারণ নয় তো? না। রাজেক হোসেন বলেন, ওটা পৌত্তলিকতা। মুসলমান অতিথিরা আপত্তি করেন। তাঁর চৌধুরী পদবীটিও তিনি বিসর্জন দেন। চৌধুরী সাহেব বলে সম্বোধন করলে তিনি সসঙ্কোচে বলেন, না, না, এই কৃষক আন্দোলনের দিনে ওদের চক্ষুঃশূল হতে চাইনে। তাঁর সমন্বয়শীল মন এমন একটি সূত্র খুঁজে বার করল যা মোল্লা এবং চাষী মুসলমান উভয়ের গ্রহণযোগ্য। মুসলমানকে তিনি বিভক্ত হতে দেবেন না। জমিদারি রক্ষা করবেন। কিন্তু অলক্ষে তিনি হিন্দুদের থেকে দূরে সরে গেলেন। ইংরেজের উপর তাঁর রাগ যা ছিল তা জল হয়ে গেল বাংলার মসনদে মুসলমানকে বসতে দেখে। কিন্তু তখনো তিনি বাঙালী। হাড়ে হাড়ে বাঙালী। জিন্নাকে বলেন "জ্বিন্" আর পাকিস্তানের নাম দেন "গোরস্থান"। না, হিন্দুর সঙ্গে তিনি লড়বেন না। ভারতবর্ষ ভেঙে খান খান করবেন না।

রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে তিনি পার্ক সার্কাসে এসে বাস

করতে লাগলেন। তাঁর মনটা কিন্তু পড়ে থাকে দেশের বাড়ীতে। . সেইখানেই ছিলেন তিনি যখন মেসোমশায়রা বিপন্ন হন। নইলে বিপদের দিন ছুটে আসতেন। পাড়ার লোকের তরফ থেকে মাফ চেয়ে বললেন, "যা হবার তা হয়ে গেছে। আর সে রকম হবে না। অমল, আমি তোকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। আমার সঙ্গে ফিরে চল। তুই ফিরে না গেলে অন্যেরা ফিরবে না। তুই ফিরে গেলে অন্যেরা তোর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তাতেও যদি ফল না হয় আমরা দুই বন্ধু শান্তি মিশন নিয়ে বেরোব। আমাদের সঙ্গে আর কেউ না আসুক, তুই আর আমি। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে তুই একলা চল রে।' মনে আছে তো রবি ঠাকুরের স্বদেশী গান? সে উদ্দীপনা কি ভোলবার? তা হলে চল সেই উদ্দীপনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। রবিবাবু বেঁচে থাকলেও তাই করতেন। তিনি চলে গিয়ে আমাদের অনাথ করে দিয়ে গেছেন। তিনি থাকলে কি এ রকম ঘটত? চল আমরা এককণ্ঠে গেয়ে বেড়াই, 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল—পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।' তবে মাঝে মাঝে ভগবান কথাটিকে বদলে দিয়ে বলতে হবে, হে রহমান।"

কথাগুলি ভালো। মানুষটি ভালো। মেসোমশায়ও যাবার জন্যে ছটফট করছিলেন। কিন্তু মাসিমার আত্মীয়রা

তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে আবার বাধবে। যঃ পলায়তি স জীবতি। দেশ ভাগ হোক বা না হোক শহর ভাগ হয়ে যাচ্ছে। লোকে পা দিয়ে ভোট দিয়ে জানাচ্ছে কোন্‌টা কী স্থান। পা কী স্থান চায় এই প্রশ্নে যে গণভোট নেওয়া হচ্ছে আজ তার থেকে বোঝা যাচ্ছে পার্ক সার্কাস হবে পাকিস্তান।

"তা হলে বাড়ীটা ?" মাসিমা আর্তনাদ করেন।

"বাড়ীটা থাকবে। তবে তার দখলকার কে হবে সেটা খোদায় মালুম।" বলেন তাঁর বড় দাদা গুপীবাবু।

"না। এ কখনো আইন হতে পারে না। হাইকোর্ট মাথার উপর থাকতে, গভর্নর মাথার উপর থাকতে আমার বাড়ী থেকে আমি বেদখল হতে পারিনে।" মাসিমা বলেন।

"ও পাড়ায় মুসলমানদেরও তো বেদখল করা হচ্ছে। করছি আমরাই।" গুপীবাবু খোশ মেজাজে বলেন। "ওটা খোদার এলাকা নয়। মা কালীর এলাকা।"

রাজেক হোসেনের প্রস্তাবে মেসোমশায়ের উৎসাহ লক্ষ করে মাসিমা গম্ভীর হয়ে যান। ভেবে চিন্তে বলেন, "কথা হচ্ছে কে আমাদের রক্ষা করবে। পুলিশ যে করবে না তা আমি জানি।"

রাজেক হোসেন তা শুনে বলেন, "আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি।"

"আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।" মাসিমা বলেন, "কিন্তু দেশটা আমার, এর মুক্তির জন্যে আমিও যৎকিঞ্চিৎ করেছি,

এর কোনোখানেই আমি বিদেশী নই, অনধিকারী নই। কেন তবে আমি আপনার গ্যারান্টি নেব? বাড়ী বড় না মর্যাদা বড়?"

ভদ্রলোক অত্যন্ত অপ্রতিভ হন। মেসোমশায় বলেন, "রাজেনদা, কিছু মনে কোরো না। আমরা হলুম ঘরপোড়া গোরু। একবার পুড়েছি কি না, তাই ভয় পাই। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার সঙ্গে শান্তির জন্যে বেরোব। কিন্তু এখন নয়।"

ভদ্রলোক বিদায় নিলে মাসিমা বলেন, "ইচ্ছা তো করে নিজের বাড়ীতে গিয়ে আনন্দে থাকতে। কিন্তু যার ঘরে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আর বাইরে গুণ্ডার দল তার প্রাণে আনন্দ কোথায়? শোন, দেবপ্রিয়, তোমাদের ওদিকে একটা ফ্ল্যাট খালি থাকে তো নিই। নীলির এখানে আর ভালো দেখায় না।"

তা ছাড়া নীলিদের পাড়াটাও যে খুব নিরাপদ তা নয়। কাছেই মুসলমানের বস্তি। আমি বলি, "আমি খোঁজ করে জানাব।"

খাঁটি লোক দুই পক্ষেই আছেন। শহরের অবস্থা তবু খারাপের দিকেই। তাই বেড়ালছানার মতো এই পরিবারের গৃহিণী তাঁর একমাত্র কন্যাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরাতে সরাতে চলেছেন। একবারও জানতে চাইছেন না মালার কী মত। আমার কিন্তু জানতে ইচ্ছা করে।

সেই যে এলাহাবাদে ওর চোখে রহস্যময় দ্যুতি দেখেছিলুম, প্রেমে পড়ার লক্ষণ, তার পর থেকে আর আমি ওর সঙ্গে

সহজভাবে মিশতে পারিনি। আমারি দুর্বলতা। ও যে কী করে, কী ভাবে তা আমার কাছে এক অজানা রাজ্য। তবে ইদানীং সেই দ্যুতি নিস্তেজ হয়ে এসেছিল। তাকে কেমন যেন ভাবাকুল দেখায়।

"মালা," আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, "আমাদের পাড়ায় যদি ফ্ল্যাট খুঁজে পাই আর সে ফ্ল্যাট মাসিমার পছন্দ হয় তা হলে কি তুমি খুশি হবে, না পার্ক সার্কাসের জন্যে ভেবে ভেবে মন খারাপ করবে?"

সে আমার দিকে এমন ভাবে তাকায় যেন কী একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেছি। তার পর বলে, "কোথায় থাকব, কী খাব, কী পরব এসব তো আমার ভাবনা নয়। আমার একমাত্র ভাবনা মুক্তা ঝরার জল আর সোনার শুকপাখী কে আনবে। কবে আনবে! দেশ যে গেল! সেবারে যদি কেউ আনতে যেত আর আনতে পারত তা হলে কি হিরোশিমায় পরমাণু বোমা পড়ত? এবারেও সেই রকম কিছু না হয়।"

পাগল আর কাকে বলে! আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাগলামির লক্ষণ অনুসন্ধান করি। সত্যি, মেয়েদের সময়ে বিয়ে দেওয়া উচিত। না দিলে নানান উপসর্গ দেখা দেয়।

"এই সেই রূপকথার রাজ্য।" মালা বলে আমাকে হতচকিত করে। "এরই কথা শুনেছি, এরই স্বপ্ন দেখেছি। আমার জন্মান্তরের স্মৃতিতেও এরই ছবি আঁকা। রক্তের নদী হাড়ের পাহাড়। সব মিলে যাচ্ছে। তা হলে মায়াপাহাড়ই

বা না মিলবে কেন? মিলবে, মিলবে। খুঁজতে বেরোলে মায়াপাহাড়ও মিলবে। মিলবে মুক্তা ঝরার জল। সোনার শুকপাখী। আহা, বেচারিরা! পথের ধারে পড়ে পাথর হয়ে গেছে। তাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়ে বাঁচাতে হবে। তারা যখন ঘরে ফিরে যাবে তাদের মা বোনেরা শুধোবে, কী এনেছ দেখি? তখন তারা বলবে, এই যে এনেছি সোনার শুক। তখন আর কী! তখন সবাই মিলে মনের সুখে বাস করবে।"

মালা বলে যায় কিসের ঘোরে। সে যেন জেগে থেকেও ঘুমিয়ে। সে যেন জাগরণের প্রতি নিদ্রিত, বাস্তবের প্রতি অচেতন। মায়াবাদীরা যেমন বলেন এই জগৎটা একটা মায়া, একটা স্বপ্ন। এদিকে আমি ভাবছি তার নিরাপত্তার জন্যে বাসার সন্ধানে বেরোব। আর ওদিকে সে কিনা ভাবছে বিপদ মাথায় করে মায়াপাহাড়ের সন্ধানে পা বাড়াবে। এই তার সময় বটে!

মালার ওই সাঙ্কেতিক ভাষা একমাত্র আমিই বুঝি। তার মাও বোঝেন না। কিংবা বোঝেন হয়তো। নইলে সেই দুর্দিনেও তাকে পাত্রস্থ করার জন্যে অস্থির হতেন না। একদিন আমাকে বলেন, "মানুষের জীবন এমনিতেই অনিশ্চিত। এখন তো আরো। আমাদের যদি হঠাৎ কিছু হয় তা হলে অন্তত এইটুকুন আশ্বাস থাকবে যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেছি। আমি আর অপেক্ষা করতে চাইনে, দেবব্রত।"

"তা হলে পাত্র পাওয়া গেছে, মাসিমা। খুব—খুব সুখবর।" আমি বলি সকপটে।

"পাকাপাকি হয়নি। কথাটা গোপন রাখতেই হবে। তবে তুমি হলে আমাদের আপনার লোক। তোমার কাছে ভাঙতে পারি।" তিনি অকপটে বলেন।

কুমুদিনী বলে মাসিমার এক সই আছেন। সেই বাল্যকালে ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়েছেন। তাঁর আছে এক গুণবান ছেলে। সোমনাথ বিলেতে সাত বছর কাটিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছে। কিন্তু থাকবার জন্যে নয়। ব্রিস্টলের কাছে সে প্যানেল কিনে ডাক্তারি করছে। এরই মধ্যে বাড়ী করেছে। এখন তার অভাব বলতে আর কিছু না। একটি বৌ। ছেলেটি মাতৃগতপ্রাণ। মা যাকে পছন্দ করবেন তাকেই সে বিয়ে করবে। বিয়ে করে বিলেত নিয়ে যাবে।

মালার সই মা মালাকেই পছন্দ করেছেন। সোমনাথেরও মালাকে মনে ধরেছে। মাসিমা কিন্তু মনঃস্থির করতে পারছেন না। তাঁর একমাত্র সন্তান যাবে সাত সমুদ্র পারে। তাও এক আধ বছরের জন্যে নয়। কে জানে কত কাল সোমনাথ ও দেশে প্র্যাকটিস করবে? মেয়েকে অমন করে দেশান্তরী করতে মায়ের মন সায় দিচ্ছে না। মেসোমশায়কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "মালা যদি সুখী হয় আমরা কি অসুখী হতে পারি?"

মালাকে বলতে সে "হাঁ"-ও বলে না। "না"-ও বলে না।

একেবারে নির্বাক, তার মানে সে ভাবতে চায়। ভাবতে সময় লাগবারই কথা। বাপ মাকে ছেড়ে দেশ ছেড়ে সাত হাজার মাইল দূরে গিয়ে ঘর বাঁধা। অতকাল থাকা। রাজী হওয়া কি সোজা কথা? অপর পক্ষে অমন একটি সুপাত্র না চাইতেই হাতের মুঠোয় এসে হাজির। হাতছাড়া করতে কোন্ মেয়ে রাজী হবে? ভাবুক। মালা ভাবুক। মাসিমাও ভেবে দেখুন। তবে সোমনাথ এই নভেম্বরেই রওনা হচ্ছে। ওদিকে তার পেসেণ্টরা ইম্‌পেসেণ্ট। ডাক্তারের কি ছুটির জো আছে? অঘ্রাণের প্রথম লগ্নেই সে যাকে হয় একজনকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। মালার জন্যে বসে থাকবে না।

বাস্তবিক এমন একটি দাঁও পেলে আমিও ছাড়তুম বলে মনে হয় না। নিখরচায় বিলেত বাস। আহ্, সোমনাথটা যদি সোমলতা হতো, লেডী ডাক্তার হতো, তা হলে আমি আজকেই প্রার্থনা জানিয়ে রাখতুম। যদিও তাকে চোখেও দেখিনি। জাহাজের নামগুলো আমার মুখস্থ। সমুদ্রযাত্রার কল্পনায় আমি চঞ্চল হয়ে উঠি। "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।"

কিন্তু মালার ভাবনা মাসিমা যা মনে করেছেন তা নয়। আমি তাঁর কন্যাকে তাঁর চেয়েও ভালো চিনি। রূপকথার রাজপুত্র কবে আসবে তারই জন্যে সে অপেক্ষা করবে। আর কারো গলায় মালা দেবে না। না, বিয়ের জন্যে সে ভাবিত নয়। তার ভাবনা মুক্তা ঝরার জলের জন্যে।

সোনার শুকপাখীর জন্যে। অরুণ বরুণ তো নেই। কে যাবে ওসব আনতে? অগত্যা কিরণমালাকেই যেতে হয়।

তা বলে এই তার সময়! আমি আতকে উঠি। রোজ বাড়ী থেকে যখন বেরোই অক্ষত শরীরে ফিরব যে তেমন নিশ্চয়তা নিয়ে বেরোতে পারিনে। ফিরি যখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। অন্তত একটা দিন তো বেঁচে থাকা গেল। এই যেখানকার অবস্থা সেখানে নারীর স্থান কি অন্তঃপুরে নয়? বাইরে পা বাড়ালে কি রক্ষা আছে! কে কখন লুট করে নিয়ে লুকিয়ে রাখবে। পুলিশ তো খুঁজতে যাবে না। উদ্ধার করবে কে? কত রকম গল্প যে শুনি। কোন্ একটা গলিতে নাকি অনেকগুলি হিন্দুর মেয়েকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। গুণ্ডারা রাতভর তাদের উপর অত্যাচার করে। উঃ! রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

না। মালাকে মায়াপাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করতে দেওয়া যায় না। ভূগোলে তেমন কোনো পাহাড়ের উল্লেখ নেই। মানচিত্রে তার চিহ্ন নেই। কী একটা আজগুবি কল্পনা! তার জন্যে একটি নিষ্পাপ মেয়ে আগুনে ঝাঁপ দেবে! আমি থাকতে! যদি আমার কিছুমাত্র হাত থাকে। সেইজন্যেই আমি আমার পাড়ায় মাসিমার কথামতো বাসা খুঁজি। খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও যাই।

"আপনাদের অসুবিধে হবে, মাসিমা। সব ভালো, কিন্তু বাথরুমটা বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদী।" আমি জুড়ে দিই, "তা

হলেও আমি সুপারিশ করি। নির্ভয়ে বাস করবেন। আর ক্রমশ স্বরাজের জন্যে প্রস্তুত হবেন। ইংরেজ চলে গেলে দেখবেন রেলগাড়ীর বাথরুমও ন্যাশনালাইজ করা হবে। গভর্নমেন্ট হাউসের বাথরুমও।”

মাসিমার মুখ শুকিয়ে যায়। কিন্তু গরজ বড় বালাই। তিনি বলেন, “আচ্ছা, রাজমিস্ত্রি ডাকিয়ে যথাবিহিত করিয়ে নেব।”

বাসা পাওয়া গেছে শুনে মেসোমশায় বলেন মাসিমাকে, “রেঙ্গুন থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে প্রয়াগ। প্রয়াগ থেকে পার্ক সার্কাস। পার্ক সার্কাস থেকে ভবানীপুর। আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী!” তাঁর কণ্ঠস্বরে কাতরতা।

মাসিমা আমার সামনে লজ্জা পান। শরমে সিন্দূর হয়ে বলেন, “তা বলে রেঙ্গুনের মতো দূরে নয়। তুমি আমাকে নিয়ে গেছলে যেখানে।”

মেসোমশায় কিছুক্ষণ নীরব থেকে আমার দিকে তাকান। বলেন, “দেবপ্রিয়, তোমার মাসিমাকে বোঝাই কেমন করে যে, রেঙ্গুন আমার পক্ষে দূর নয়। বরং ভবানীপুরই সুদূর। রেঙ্গুনে ছিল আমার জীবনের কাজ, আমার যৌবনের কাজ। ভবানীপুরে আমার কাজ নেই। নিছক টিকে থাকাটা তো একটা কাজ নয়।”

“তা বলে তুমি এই ব্রাইট স্ট্রীটেই পড়ে থাকবে নাকি?

বন্ধুবান্ধবের অতিথি হয়ে চিরকাল থাকবে? তা কি হয়!” মাসিমা অনুযোগ করেন।

“না। এখানে পড়ে থাকব কেন? ওই তো রাজেনদা রয়েছে ওখানে। ও যদি থাকতে পারে আমি কেন পারব না? গুণ্ডার কাছে পরাজয় মেনে নেওয়া কি পুরুষত্ব? একটা বন্দুকও তো আছে বাড়ীতে। একেবারে নিরস্ত্র তো নই।” মেসোমশায় খাড়া হয়ে বসলেন।

“হয়েছে, হয়েছে তোমার বীরপনা।” মাসিমা শ্লেষের সঙ্গে বলেন, “এখনো কি বুঝতে পারনি যে গুণ্ডা যাকে বলছ সে-ই রাজা? রাজেক হোসেন হলেন রাজার জাত। তাঁর ভাবনা কিসের?” তার পর সংশোধন করে বলেন, “হাঁ, তাঁকেও একটু ভাবতে হয় বইকি, যদি কালীঘাটে থাকতে যান। নরবলি ইংরেজরা বন্ধ করে দিয়েছিল। শুনছি দু'এক জায়গায় ইংরেজ থাকতেই—”

মেসোমশায় যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠেন। মনে হলো আবার অপ্রকৃতিস্থ হয়েছেন। “গেল! গেল! সর্বস্ব গেল! এর পরে কে আমাদের সভ্যজাতি বলে স্বীকার করবে! ইংরেজ তো বুক ফুলিয়ে বেড়াবেই। সে-ই শ্রেষ্ঠ। সে নরবলি বন্ধ করে দিয়েছিল। আমাদের সে গায়ের জোরে হারিয়ে দিক আর না দিক, ন্যায়ের জোরে হারিয়ে দিয়েছিল। আমরা জয়ের যোগ্য নই। স্বাধীনতার যুদ্ধে জয় আমাদের হবে না।”

মালা সেখানে ছিল না। ছুটে এসে জানতে চায় কী

ব্যাপার। মাসিমা লজ্জিত হয়েছিলেন। উঠে যান। আমি গোপন করি।

মেসোমশায় পাগলের মতো বলতে থাকেন, "ইংরেজকে হারাতে হলে তার চেয়েও মহৎ হতে হয়, উদার হতে হয়। সে যেদিন স্বীকার করবে যে আমরাই বড় সেইদিন আমাদের জয়। কিন্তু এর পরে আর সে কথা উঠতেই পারে না। আমরা হেরে গেছি।"

মালা তার বাপের ভার নেয়। এই মানুষকে ফেলে সে কোন্ মায়াপাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করবে? ওদিকে মাসিমারও ভবানীপুর যাত্রা স্থগিত রইল।

টোগো আমার মুখে বিবরণ শুনে দুঃখিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বলে, "ভালোই হলো। আমার ইচ্ছা নয় যে ওঁরা চলে যান। ওঁরা আছেন বলে আমিও তো কতকটা সাহস পাচ্ছি। আর নীলিমাও তো দিনের বেলা নিঃসঙ্গ বোধ করছে না। আমি বলি, তোমার ওই ভবানীপুরের বাসায় গিয়ে কাজ নেই। ওটা তুমি বাতিল কর।"

বাসাটা বেহাত হলো। আমার মনের কোণে যে লুকোনো সাধ ছিল মালা আমার প্রতিবেশিনী হবে সে সাধ অপূর্ণ রইল। আমারি দুর্ভাগ্য।

মেসোমশায় অবশ্য আবার প্রকৃতিস্থ হলেন। কিন্তু আঘাতের চিহ্ন থেকে গেল তাঁর মুখভাবে। ছোরার আঘাতই কি একমাত্র আঘাত, না গভীরতর আঘাত? দেশের উপর

বিশ্বাস টলেছে, দেশের নিয়তির উপরে, এইখানেই তো ট্র্যাজেডি। মানুষ যদি অধঃপাতে যায়, সেইসব কদাচার যদি ফিরে আসে, আবার যদি নরবলি ও সতীদাহ চলে, আবার সেই তান্ত্রিক অভিচার, তবে স্বাধীন হয়েই বা কোন্ কীর্তি স্থাপন করব আমরা ?

"আমার ভারতবর্ষকে আমি হারিয়ে ফেলছি," মেসোমশায় বলেন বিষাদভরে।

"বেদনার জগদ্দল পাথর চেপে আছে বুকের উপর। কেন এমন হলো ? হিন্দু মুসলমান কি ভাই ভাই নয় ? ভাই যদি না হবে তো তৃতীয় পক্ষকে কেন এতদিন দোষ দিয়ে এসেছি যে, সে আমাদের বিভক্ত করতে চায় ? আমরা যদি এক পাড়ায় থাকতে না পারি তবে এক শহরে থাকব কী করে ? যদি এক শহরে থাকতে ভয় পাই তবে এক দেশে থাকব কী করে ? তা হলে তো দেশ এক হতে পারে না। দুই কলকাতার মতো দুই বাংলা, দুই ভারত। তাদের ভারতকে তারা যদি পাকিস্তান নাম দেয় আমরা বলবার কে !"

মেসোমশায় জেদ ধরলেন যে পার্ক সার্কাসে তিনি একাই ফিরে যাবেন ভারতবর্ষের উপর বিশ্বাস প্রমাণ করতে। মাসিমা তাঁকে একটা ঘরে বন্ধ করে রটিয়ে দিলেন যে তাঁর মাথা খারাপ। মালা তা সত্য ভেবে মন খারাপ করে।

ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ শোনা যায়, "ইতিহাস, তুমি বড় নিষ্ঠুর ! তুমি বড়ই নিষ্ঠুর ! তুমি আমাদের ইচ্ছাপূরণের

নিমিত্ত নও। আমরাই তোমার ইচ্ছাপূরণের নিমিত্ত। তা হলে আমাদের কর্তৃত্ব কোথায়? স্বাধীন ইচ্ছা কি কথার কথা? আমার যদি হাত না থাকে তো আমি আছি কেন? আমি আছি কেন?"

আমি আছি কেন? আমিও প্রশ্ন করি। আছি ছবি আঁকতে। এ যদি সভ্যতা না হয়ে অসভ্যতা হয়ে থাকে তবু এর ছবি আঁকতে হবে। কিন্তু পারিনে। এ যে বড় নিষ্ঠুর!

আট

প্রকৃতির রাজ্যে আকস্মিক বলে কিছু আছে কি? ঝড় বল, বন্যা বল, ভূমিকম্প বল, দাবানল বল, কিছুই আকস্মিক নয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তার প্রস্তুতি চলে। আমরা কেউ তার খবর রাখিনে, তাই বিপর্যয় ঘটলেই বলি আকস্মিক।

তেমনি ইতিহাসের জগতেও। দশকের পর দশক, শতকের পর শতক, তার প্রস্তুতি চলেছে। কারো দৃষ্টি অত দুর যায়নি। যেই ঘটে গেল নোয়াখালীর হাঙ্গামা অমনি আমরা তার আকস্মিকতায় অভিভূত হলুম। আরো অনেকের মতো আমারও হলো বুদ্ধিভ্রংশ। আমি আমাব ইংরেজ বন্ধুদের যাকে দেখি তাকে বলি, "শিগগির। আজকেই। এই মুহূর্তে সৈন্য পাঠাতে হবে। নইলে জনগণ ক্ষমা করবে না। আইন যে যার নিজের হাতে নেবে।"

সৈন্য পাঠালে মুসলিম লীগ ক্ষমা করত না। শেষ পর্যন্ত গেল কিছু সৈন্য, কিন্তু বিস্তর গড়িমসির পর। ততদিনে বিহারের জনতা ক্ষেপে গিয়ে পাল্টা হাঙ্গামা বাধিয়েছে। সে আরো বীভৎস। আমার অশুভ বাক্য যে অমন করে ফলে যাবে তা কি আমি জানতুম? মর্মে আঘাত পেলুম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খুশিও হলুম। দেখলে তো? সৈন্য না পাঠানোর কী পরিণাম?

তখন ভেবে দেখিনি, ভাববার সময় ছিল না, সৈন্য পাঠানোর কী পরিণাম। গান্ধীজীর কল্যাণময় প্রয়াস গোড়ার দিকে যেমন কাজ দিচ্ছিল সৈন্য গিয়ে পড়ার পর আর তেমন দিল না। লোকে ধরে নিল যে গান্ধী আছেন বলেই সৈন্য আছে। হিন্দুরা বলতে লাগল, গান্ধীজীর থাকা চাই, তিনি থাকলে সৈন্যও থাকবে। মুসলমানরা বলতে লাগল, গান্ধীজী চলে যান, তিনি চলে গেলে সৈন্যও চলে যাবে। হিংসা আর অহিংসা দুই একসঙ্গে কাজ করলে অহিংসার ক্রিয়া ব্যাহত হয়। গান্ধীজীর গতি রুদ্ধ হলো। ভক্তরাই বলতে আরম্ভ করলেন, অহিংসা ব্যর্থ হয়েছে। অতএব অন্য উপায় দেখা যাক। দেশ ভাগ না করে উপায় নেই।

যাক, এসব পরের কথা। আগে কী হলো বলি। নোয়াখালির বৃত্তান্ত শুনেই গান্ধীজী সেখানে রওনা হন। তিনি করবেন অথবা মরবেন। ওই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে করবার কী আর আছে! নিশ্চিত মরণের মুখে যাত্রা। কে জানে কোন্ দিন খবর আসে তাঁর হয়ে গেছে। তখন সারা ভারত জুড়ে বইবে রক্তের নদী। জমে উঠবে হাড়ের পাহাড়। মালার রূপকথা সত্য হবে। কী সর্বনাশ!

মালার মনেও সেই আশঙ্কা। শুধু আশঙ্কা নয়, অস্থিরতা। সে বলে সেও যেতে চায় নোয়াখালী। তা শুনে তার মা তাকে নজরবন্দী করেন। তার বাবাকে বলা হয় না। পাছে তিনি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যান।

এমন সময় মনোরমা কওল বলে এলাহাবাদের সেই মেয়েটির আবির্ভাব। ইতিমধ্যে তার বিয়ে হয়ে গেছে। মনোরমা কওল এখন মনোরমা হাক্‌সার। স্বামীর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সেও যাচ্ছে নোয়াখালী। সুখে সংসার করার সময় নয় এটা। ভারতের নারীত্বের প্রতি নোয়াখালী একটা চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ সে গ্রহণ করেছে। দ্রৌপদীর মতো সেও কেশ বাঁধবে না, যতদিন না নোয়াখালীর অন্যায়ের প্রতিকার হয়।

মালাকে এবার ঠেকায় কে? আবার তার অঙ্গে শালোয়ার কামিজ ওঠে। অনুমতি না নিয়েই সে তৈরি হতে থাকে। মালা যেতে উদ্যত দেখে মাসিমা মনে মনে বিরূপ। অথচ মুখ ফুটে বারণও করতে পারেন না। মনোরমাও তো তাঁরই মেয়ের মতো আর একটি মায়ের মেয়ে। তাঁর আর একটি মেয়ে। কতদূর থেকে সে ছুটে এসেছে, কতদূর সে ছুটে যাচ্ছে ভারত-নারীর সম্মান রক্ষা করতে। সে যদি যায় তবে মালারও যাওয়া উচিত। অথচ বিবাহযোগ্যা কুমারীর পক্ষে নোয়াখালীযাত্রা যেমন ভয়াবহ তেমনি কলঙ্ককর। তা ছাড়া সোমনাথ ছেলেটি তো তার জন্যে সবুর করবে না।

তিনি মেসোমশায়ের শরণাপন্ন হন। বলেন, "মানি দেশের প্রতি কর্তব্য আছে। তা বলে একমাত্র সন্তানের অমঙ্গল ডেকে আনতে পারিনে। এখন তুমি যদি ওকে একটু বোঝাও।"

উল্টো ফল হয়। মেসোমশায় ধরে বসেন, "আমিও যাব।"

"সে কী! তুমি যাবে কী করতে।" মাসিমা যেন আকাশ থেকে পড়েন।

"গান্ধী যাচ্ছেন কী করতে? এই সাতাত্তর বছর বয়সে। আমি তো অত বুড়ো হইনি। আমিও যাব।" মেসোমশায় অবুঝ।

"গান্ধী যাচ্ছেন কী করতে?" মাসিমা ভাবনায় পড়েন। "গান্ধী হলেন দেশের নেতা। দেশকে অহিংস নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। এখন যদি না দিতে পারেন তবে অহিংসাও গেল, নেতৃত্বও গেল। কাজ কী তা হলে তাঁর বেঁচে থেকে? সেই জন্যেই তাঁর পণ—করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে। তাঁর কাছে এটা জীবন মরণ সমস্যা। সমাধান তাঁকে করতেই হবে। নইলে তাঁর জীবন বৃথা।"

"আমারও।" সংক্ষেপে বলেন মেসোমশায়। তার পর বিশদ করেন। তদ্‌গত ভাবে। "এতদিন আমি চিন্তামগ্ন ছিলুম। আমরা কি নিমিত্তমাত্র? ইতিহাসই কর্তা? ইতিহাসের উপর আমাদের হাত খাটে না? গান্ধী উত্তর দিচ্ছেন—তা নয়। আমরাই চালক। মরণ পণ করে আমরাই ইতিহাসের রথ চালাব, চাকা ঘোরাব। মরে গিয়েও ঠেলা দিয়ে যাব। ইতিহাস সৃষ্টি করব। নিমিত্তমাত্র হয়ে বাঁচতে চায় কে?"

মেসোমশায়ের পরিষ্কার কোনো ধারণা ছিল না নোয়াখালী গিয়ে তিনি কী ভাবে চাকা ঘোরাবেন। কিছু একটা যে

করা উচিত তা তো আমরা সকলেই বুঝতে পারছিলুম, কিন্তু কী সেটা ? কার দায়িত্ব সেটা ? কার করণীয় সেটা ? এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। এই যেমন আমার মতে সৈন্য পাঠানো। ইংরেজের দায়িত্ব। বড়লাটের করণীয়। গান্ধীজীর মত কিন্তু বিপরীত।

মেসোমশায় কি সহজে নিরস্ত হন ? ডাক্তারকে দিয়ে চেক্‌আপ করাতে হলো। হাই ব্লাডপ্রেসার। কিন্তু মালাকে তিনি নিবৃত্ত করেন না। বলেন, "মনোরমা যখন যাচ্ছে তখন মালাও ইচ্ছা করলে যেতে পারে। যদি করবার কিছু না থাকে ফিরে আসতে পারে। এই সঙ্কটে আমাদের প্রত্যেকের বিবেকের স্বাধীনতা আছে। মালারও। তার বিবেক যদি তাকে স্থির থাকতে না দেয় তবে তাকে বিপদের মুখে যেতে দেওয়াই নিরাপদ।"

মাসিমা কি মেনে নিতে পারেন ? আমার উপর ভার দেন মনোরমাকে বোঝাতে। কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনি মনোরমা বুঝলে মালাও বুঝবে।

মনোরমা হলো সাক্ষাৎ আগুন। শুনেছি সেই অগাস্ট আন্দোলনের সময় আগুন নিয়ে খেলেছে। কিন্তু আগুনে হাত পোড়ায়নি। সমানে পড়াশুনাও চালিয়েছে। ওস্তাদ মেয়ে।

"মিসেস হাক্‌সার," একটু ভয়ে ভয়ে বলি, "আপনি যেমন সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতী। নিশ্চয় এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করেছেন

যে নোয়াখালীতে যা ঘটেছে তা দ্বিতীয় এক অগাস্ট আন্দোলনের জের। এর পিছনেও মাথা আছে। যা ঘটেছে তা আগে মানুষের মাথায় এসেছে। এটা হলো এক জাতের খেলা। তাস খেলা। এ খেলায় ও-পক্ষের হাতে একখানা তাস বেশী আছে। নোয়াখালীতে সেটা ওরা খেলেছে। আমাদের হাতে সে তাস নেই। থাকলেও আমরা ঘৃণা করতুম খেলতে। এই হলো সমস্যা। এর সমাধান যদি আপনার জানা থাকে তবে নোয়াখালী অবশ্যই যাবেন। নয়তো গিয়ে শয়তানদের কবলে পড়বেন। তখন"—আমি আবো ভয়ে ভয়ে বলি, "অক্ষত থাকতে পারবেন কি ?"

"কী!" মনোরমা আগুনের মতো লাল হয়ে যায়। মারতে আসে না এই ভাগ্যি ! "আপনার মনটা অতি মূঢ়, নীচ আর কদর্য। কোন্ মুখে আপনি ও কথা উচ্চারণ করতে পারলেন ! ছি ছি ! বেশ তো, এতই যখন আপনার সন্দেহ, তখন চলুন না আপনিও আমাদের সঙ্গে। আমাদের পাহারা দিতে। রক্ষা করতে। কেমন ? সাহস আছে ?"

আমি চমকে উঠি। বলে কী ! আমি যাব ওই মগের মুলুকে ! খালি হাতে ! অন্তরে প্রেম থাকলে গান্ধীজীর মতো অকুতোভয়ে আততায়ীর সম্মুখে দাঁড়াতুম। প্রেমই আমার অস্ত্র। তা তো নয়। অক্ষম ক্রোধে আমি দগ্ধ হচ্ছি। আর "সৈন্য" "সৈন্য" বলে চেঁচাচ্ছি।

সে যা একখানা সীন সৃষ্টি করে। আমারি উপর যত ঘৃণা

আর অবজ্ঞা আর রাগ আর জ্বালা। যেন আমিই নোয়াখালীর নারীখাদক বাঘ। আমাকেই আসামীর মতো কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। বলতে হয়, "বহিন, মাফ কীজিয়ে।"

সে কি থামতে চায়! বলে যায়, "আমরা মেয়েরা কী করতে নোয়াখালী যাচ্ছি? আমরা কি জানিনে কত বড় ঝুঁকি নিচ্ছি? রাষ্ট্র যেখানে নারীর শত্রু। স্বামীর কাছে আমার কোলের ছেলেকে রেখে এসেছি আমি, কারো কথায় কান দিইনি। সে কি সামান্য কারণে? না, ভাইজী। একটি নারীর অপমানে সব নারীর অপমান। আমারও অপমান। আর এ তো একটিমাত্র নারী নয়, শত শত নারী। এদের আকুল ডাক যদি আমি না শুনি আমার আকুল ডাক কে শুনবে, যদি আমার কপালেও সে রকম কিছু ঘটে? না, না। বলা যায় না। ইংরেজের রাজত্ব শেষ হয়ে আসছে, তাই যেখানে যত উচ্চাভিলাষী আছে মাথা তুলছে। নারীও তাদের কাছে রাজ্যজয়ের প্রতীক।"

আমিও সেই কথা বলি। এ সাধারণ নারীহরণ নয়। এ হলো যুদ্ধজয়।

"তা হলে," মনোরমা যোগ করে, "আমাদের কাজ হবে অকুতোভয়ে এগিয়ে যাওয়া। প্রত্যেকটি অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করতে হবে। উদ্ধার করে ঘরে ফিরিয়ে দিতে হবে। ঘরের লোক হয়তো বলবে, যার সতীত্ব গেছে তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে কী হবে? অশুচি পাত্র কি রান্নার কাজে লাগে? ওদের

বোঝাতে হবে, ধর্ষিতাদেরও বোঝাতে হবে যে, দেহ কোনো অবস্থাতেই অশুচি হতে পারে না, যেমন আগুন কোনো অবস্থাতেই অশুচি হয় না। আত্মার বেলা যা সত্য দেহের বেলাও তাই। হিন্দু সমাজের দোষ হচ্ছে সতী অসতী দুই তার চোখে অশুদ্ধ, যদি সতীর গায়ে রাক্ষসের ছোঁয়া লাগে। গান্ধীজী আবার প্রতিরোধ করতে গিয়ে মরণের বিধান দিচ্ছেন। মরে গেলে অবশ্য সমাজের সুবিধা হয়। আমি কিন্তু সমাজকে অসুবিধায় ফেলতে চাই। তাকে তার ভ্রান্ত সংস্কার ত্যাগ কবতে হবে। নইলে বারো মাস ভয়ে ভয়ে বাস করতে হবে। কে কখন গায়ে হাত দেয়!”

আমি বুঝতে পারি যে এটাও একটা জীবন মরণ সমস্যা। মেয়েদের কাছে। তাই মনোরমার কথা মেনে নিই। মালাকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা, তবু মাসিমার তুষ্টির জন্যে সরাসরি তার কাছে যাই। বলি, “মনোরমা যাচ্ছে, যাক। তুমি নাই বা গেলে, মালা। তোমার বাবার হাই ব্লাডপ্রেসার। তোমার জন্যে ভেবে ভেবে তোমার মাও অসুখ না বাধিয়ে বসেন। এমনিতেই তো বাড়ীর কথা ভেবে ভেবে অসুখী।”

মালা চিবুকে হাত রেখে চিন্তাকুলভাবে বলে, “তাঁদের জন্যেই তো এতদিন কোথাও বেরোইনি। জীবনে আমার নিজেরও তো একটা কাজ থাকতে পারে, যার জন্যে আমার জন্ম। অরুণ বরুণ তো যাবে না, আমিও যদি না যাই

মুক্তা ঝরার জল আনবে কে! দিন দিন আরো জরুরি হয়ে উঠছে। মনোরমা না গেলেও আমি যেতুম! ওর যাওয়া নোয়াখালী পর্যন্ত। আমার যাওয়া নোয়াখালী ছাড়িয়ে। কে জানে কোন্ অচিন ঠিকানায়! নোয়াখালী আমার পথে পড়ে!"

আমার অন্তরে মোচড় লাগে। আবেগে কণ্ঠরোধ হয়। নইলে আমিও হয়তো উচ্ছ্বাসের ঠেলায় বলে বসতুম, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব, মালা। যতদূব তুমি যাবে।"

না। আমার কাজ নয় মায়াপাহাড়ের অভিমুখে যাওয়া। মায়াপাহাড়ের অস্তিত্বই আমি মানিনে। আমি অতিবাস্তববাদী। অবাস্তববাদী নই। আর যা নিয়ে আমি আছি তা কম জরুরি নয়। তুলি দিয়ে আমি সৌন্দর্য জয় করে আনছি সব মানুষের জন্যে। কোন্ রাজ্য থেকে জয় করে আনছি সে আমিই শুধু জানি। সেখানে আর কারো প্রবেশ নেই। আমিও একজন রাজপুত্র। আমার তুলি আমার অসি। কেউ যদি মনে করে এটা অকাজ তবে আমি বলব, আজকের সব কাজ যখন বাসি হয়ে যাবে তখন আমার ছবিগুলি তাজা থাকবে। অন্তত এই বিশ্বাস নিয়ে আমি বেঁচে আছি।

মালা বলে করুণ স্বরে, "বাবাকে মা দেখবেন, মাকে বাবা। আমি যদি বিয়ে করে বিলেত যেতুম তা হলেও তো তাঁদের ছাড়তে হতো, তাঁরা আমাকে ছেড়ে থাকতেন।

ভেবে ভেবে মন খারাপ করা বা শরীর খারাপ করা যে ভালো নয় এ কথা তাঁদের বোঝানোর জন্যে আপনারা রইলেন। আমি যেখানেই যাই না কেন চিঠি লিখব। বিপদে যদি পড়ি খবরটা কেউ দেবে। কেনই বা পড়ব? সবাইকে যে বাঁচাতে যাচ্ছে কেউ কি তাকে মারতে পারে? না, কেউ আমার পর নয়।"

আমি হাল ছেড়ে দিই। মাসিমাকে বলি, "ওরা যাবেই।"

তার পরে আর কী? একদিন মনোরমা আর মালা শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠে বসে। আমরা যারা তাদের তুলে দিতে গেছলুম রুমাল নাড়ি আর কয়লার গুঁড়োর জ্বালায় চোখ মুছি। মাসিমা যাননি। মেসোমশায় যাননি। তাঁরা কাতর।

মেসোমশায়কে যাই সহানুভূতি জানাতে। তিনি ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, "জানো হয়তো, প্রাচীনকালে থেকে একটা ঋষিবাক্যের প্রচলন আছে। মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন। মিথিলায় যখন আগুন লাগে আর জনক রাজার প্রাসাদে আগুন ধরে তখন আত্মস্থ হয়ে তিনি উচ্চারণ করেন, আমার কিছু পুড়ছে না। অর্থাৎ আমার সত্যিকার সম্পদ তো বাইরে নয় যে পুড়বে। হায়! ও কথা আমি বলতে পারছি কই! আমার ঘরে আগুন ধরেছে। আমার যা পুড়ছে তা অকিঞ্চিৎকর নয়।"

আমার বুঝতে বাকী ছিল না যে মেসোমশায়ের নোয়াখালী যেতে চাওয়ার মূলে ছিল মালাকে সাহায্য করার জন্যে তার কাছে থাকার অভিপ্রায়। বাধা তাকে দেওয়া যেত না, দিলে অন্যায় হতো। সেও যেত, তিনিও যেতেন। তা তো হবার নয়। তিনি কেবল মেয়ের কথাই ভাবছেন আর মন খারাপ করছেন। নোয়াখালী ভীষণ ঠাঁই। কী যে আবার ঘটে কে জানে! তিনি থাকলে তবু যা হয় একটা কিনারা করতেন।

আমি বলি, "মেসোমশায়, মিথিলায় করে কী ঘটেছিল জানিনে, কিন্তু বাংলাদেশে আজ আমাদের চোখের সুমুখে যা ঘটে যাচ্ছে তা হাজার বছরে একবার ঘটে। হিন্দুদের মেজাজ দেখে মনে হচ্ছে তারা ইতিহাসের পাতা থেকে সাতশ' বছরের যবন সংস্পর্শ একদিনেই মুছে ফেলবে। আর মুসলমানদের যা মেজাজ তারাও আধখানা হিন্দুস্থান কেটে নিয়ে সেখান থেকে হিন্দুকে নিশ্চিহ্ন করবে। এই দাবানলের মাঝখানেই বসে আছি আমরা। কলকাতা কিছু কম ভীষণ নয়। এখানে থাকলেও মালা একদিন অস্থির হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ত। আপনি কি তার সঙ্গে পথে পথে ঘুরতেন? আপনার পক্ষে সেটা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। আপনি আপনার কাজে মন দিতে চেষ্টা করুন। যেমন আমি করছি।"

মেসোমশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। "আমার কাজ! সে আমি ত্রিবেণীর জলে বিসর্জন দিয়ে এসেছি, দেবপ্রিয়।

সংসারে সকলের কাজ আছে। আমারি কাজ নেই। কোনো মতে সময় কাটানোই আমার কাজ। সময় মানে তো আয়ু। আমাকে আয়ু ক্ষয় করতে হবে যতদিন আছি। জানো তো, প্রকৃতি কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অব্যবহার পছন্দ করে না। ল্যাজ কাজে লাগাইনি বলে আমাদের ল্যাজ খসে গেছে। তেমনি আয়ুর সদ্‌ব্যবহার না করলে আয়ুও কমে যাবে।"

আমি হেসে বলি, "ল্যাজ খসে গেছে বলে আমার আফসোস নেই, মেসোমশায়। তবে প্রাণটা খসে গেলে সত্যি প্রাণে লাগবে।"

মেসোমশায়ের জীবনের মূল্য এখন ঘরগৃহস্থালির প্রয়োজনে এসে ঠেকেছে। এই নিয়ে তিনি অন্তরে অন্তরে অসুখী। তার উপর মালার মায়াপাহাড় অভিমুখে যাত্রা। মালা না গেলেই ভালো করত।

মাসিমার আশা ছিল মালা নিজের ভুল বুঝতে পেরে দিন কয়েকের মধ্যেই ফিরে আসবে। তখন তার বিয়ে দিয়ে তাকে তিনি বিলেত পাঠিয়ে দেবেন। সোমনাথও রাজী ছিল আরো কিছু দিন অপেক্ষা করতে। কিন্তু তার মা কুমুদিনী দেবী মালার উপর বিরক্ত। অন্য জায়গায় মেয়ে দেখা সমানে চলছিল।

মালা যেখানে গেছে সেখান থেকে শুধু হাতে ফিরে আসার জন্যে যায়নি। গেছে মুক্তা ঝরার জল সোনার শুক-

পাখী আনতে। মাসিমা এ কথা জানতেন না। তাই দিন কয়েক যেতে না যেতেই অধীর হলেন। বলতে লাগলেন, "ওর ফিরতে অত দেরি হচ্ছে কেন? আমি তো ভেবেছিলুম যাবে আর আসবে। দেখবার কী আছে ওই বাঙালদেশের অজ পাড়াগাঁয়? নোয়াখালী যে কোথায় তাই আমি জানিনে।"

আমিও কি জানি! ঢাকার কাছাকাছি কোথাও হবে। বোধহয় আসামের দিকে। পাহাড় আছে নিশ্চয়। নইলে মালা কেন যায় মায়াপাহাড়ের খোঁজে? একটু রহস্যময় করে বলি, "দেখবার কিছু আছে বইকি। সাধে কি অত লোক ওখানে ছুটেছে! ভারতের সব অঞ্চল থেকে যাত্রীর ভিড়। যেন রূপকথার রাজপুত্রের মিছিল। রাজপুত্রের ছদ্মবেশে রাজকন্যাও।"

বলতে ভুলে গেছি মনোরমা ও মালা দু'জনেরই পরণে ছিল সালোয়ার কামিজ।

সোমনাথ বলে সেই যে সোনার চাঁদ ছেলেটি সে সত্যি অনেক দিন অপেক্ষা করেছিল। শেষে হতাশ হয়ে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে দেশান্তরী হলো। মাসিমা আক্ষেপ করে বললেন, "এ দুঃখ ভোলবার নয়।"

কেমন করে তাকে বলি যে তাঁর কাছে যেটা দুঃখ আমার কাছে সেইটেই সুখ! মালা যদি বিয়ে করত, যদি বিলেত চলে যেত, যদি ও দেশে বসবাস করত আমি তাকে সব রকমে হারাতুম। সোমনাথ এমন কিছু হারায়নি। সে বৌ চেয়েছিল, বৌ

পেয়েছে। মালার বদলে দীপা কিছু মন্দ মনোনয়ন নয়। বিয়েতে আমিও যোগ দিয়েছিলুম। দীপাকে আমার ভালোই লেগেছিল। সোমনাথকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলুম। তার মাকেও বলেছিলুম, "আপনি কেবল রত্নগর্ভা নন, রত্নশ্বশ্রূ। সোমনাথের সঙ্গে খাসা মানিয়েছে। রতনে রতন চেনে।"

মালা পৌঁছনোর খবর দিয়ে তার করেছিল। চিঠিও লিখেছিল। মাসিমা আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন। চিঠিতে ছিল, "মা মণি, তোমার মালা যেখানেই থাকুক তোমার কোলেই আছে। আর তার বাবার চোখের তলেই। আমার জন্যে ভেবো না, আমাকে পরের জন্যে ভাবতে দাও। পরকে যাতে আমি আপন করতে পারি।"

আমাকেও তার মনে ছিল। আশ্চর্য! আমার নামেও একদিন একখানা চিঠি এলো। পড়ে দেখি লিখেছে, "বিচারের সময় পরে। এখন ভালোবাসবার সময়। ভালোবাসলে নির্বিচারে ভালোবাসতে হবে। পাপীকেও। অপরাধীকেও। রাক্ষসকেও। তা যদি না পারি তবে আমরাই ফেল। যাদের পাপী ভাবছি, অপরাধী ভাবছি, রাক্ষস ভাবছি তারাও তো মানুষ। তাদেরও তো মা বোন আছে। মা বোনের ইজ্জৎ তাদের কাছেও তো দামী। তাদেরও তো বাপ দাদা আছে। বাপ দাদার প্রাণ তাদের কাছেও তো দামী। তারা স্বভাবদুর্বৃত্ত নয়। সৎ চাষী। সৎ কারিগর। মাথার ঘাম

পায়ে ফেলে খেটে খায়। ঈশ্বরকে ভয় করে। মানুষের সঙ্গে রকমারি সম্পর্ক পাতায়। কেন তবে পাগল হলো? এক এক জন এক এক উত্তর দেন। আমি শুনে যাই। সরল কথাটা হলো, মানুষে মানুষে ভেদ নেই। ভেদবুদ্ধিটাই সব চেয়ে দোষের। তার থেকেই যাবতীয় দোষের উৎপত্তি।"

আমার তখন ক্রোধে অন্তরাত্মা জ্বলছে। এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা এসে আমাকে আবো রাগিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন মুসলমানরা নাকি আমাদের ব্রাদার্স। তা শুনে আমি ঝাঁজের সঙ্গে জবাব দিয়েছি, "হুঁ। ব্রাদার্স-ইন-ল।" তখন খেয়াল হয়নি যে কথাটা দু'ধারে কাটে। পরে খেয়াল হলে জ্বলে পুড়ে মরি। বিদেশিনী ছবি কিনে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। নইলে বুঝিয়ে বলতুম ব্রাদার্স-ইন-ল কোন্ অর্থে।

মালার সঙ্গে তর্ক কবতে ইচ্ছা ছিল। করতে সাহস হলো না। সে কি এইজন্যেই নোয়াখালী গেছে যে বর্বরকেও, বন্যকেও নির্বিচারে ভালোবাসতে হবে? তা হলে নাট্শীদেরও ভালোবাসতে হয়। অসম্ভব। ওর চেয়ে সাপকেও ভালোবাসা সহজ। গান্ধীজীর অহিংসামন্ত্রে কালসাপও বশ মানতে পারে, কিন্তু নোয়াখালীর ওইসব নারীধর্ষক! অবিশ্বাস্য। ওদের জন্যে চাই মার্শাল ল। কোর্ট মার্শাল। সরাসরি ফাঁসী।

মালাকে এসব কথা লিখিনে। লিখি, "ভুলে যেয়ো না যে তুমি আনতে গেছ মুক্তা ঝরার জল সোনার শুকপাখী।

গান্ধীজীকে ছেড়ে দাও গান্ধীজীর কাজ। তাঁর কাজ তাঁর। তোমার কাজ তোমার।”

আমার মুসলমান সুহৃদ্‌দের সঙ্গে আমার ব্যবধান প্রতিদিন বেড়ে চলেছিল। তখন খেয়াল হয়নি যে ব্যবধান যদি বাড়তে বাড়তে অলঙ্ঘনীয় হয় তবে পায়ের তলার মাটি ভেঙে দু’ভাগ হয়ে যায়, মাঝখানে দেখা দেয় ভাদ্রমাসের পদ্মা। পনেরোই অগাস্ট এলো। আমার শিল্পীবন্ধুদের একদলকে বসিয়ে দিল কলকাতায়, একদলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঢাকায়। তার পর থেকে অবিরল চোখের জল ফেলছি। কিন্তু সে কথা পরে। ডিসেম্বর মাসে কে জানত অগাস্ট মাসে কী আসছে।

মালা সেই যে আমাকে চিঠি লিখল তারপর একেবারে নীরব। বোধহয় আমাব চিঠির সুর তার ভালো লাগেনি।

প্যারিসে গিয়ে আধুনিকতম চিত্রকরদের সঙ্গে পা মিলিয়ে নেবার জন্যে আমার প্রাণ কবে থেকে আকুল। যাইনি, তার কারণ প্রধানত মালাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন কর্তব্যবোধ। আরো কারণ ছিল। আমি একান্তভাবে চেষ্টা করছিলুম আমার ভারতীয় পূর্বসূরীদের সঙ্গেও পা মিলিয়ে নিতে। এ এক দুঃসাধ্য কসরৎ। এক পা মেলাতে হবে ইউরোপীয় আধুনিকের সঙ্গে। আরেক পা মেলাতে হবে ভারতীয় অতীতের সঙ্গে। এ যেন দুই নৌকায় পা রেখে টাল সামলে চলা।

এখন মালা নেই। কবে ফিরবে কে জানে? ইচ্ছা করলে স্বচ্ছন্দে প্যারিস ঘুরে আসা যায়। ওই সোমনাথের সঙ্গেই

এক জাহাজে ভাসতে পারা যেতো। ইচ্ছাটাকে দমন করতে হলো। ভারতেরই খাতিরে। দাঙ্গাহাঙ্গামার দ্বারা নির্ণীত হয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের সংজ্ঞা। অনেকের বিশ্বাস ভারতবর্ষ মুসলমানের দেশ নয়, যেমন ইংরেজের দেশ নয়। তার ঐতিহ্য মুসলমানের নয়, যেমন ইংবেজের নয়। এরা মেঘের মতো উড়ে এসেছে, জল বর্ষণ করেছে, ফুরিয়ে গেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব আছে ও থাকবে। অর্থনীতিক্ষেত্রেও। কিন্তু জাতীয় সত্তায় বা জাতীয় চেতনায় এদের ধারা বহমান নয়। আমরা যদি সত্যিকার মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গ চাই ইরানে যাব, সীরিয়ায় যাব। যদি সত্যিকার ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংসর্গ চাই প্যারিসে যাব, রোমে যাব। কিন্তু এ দেশের মুসলমান বা ইউরোপীয়ের কাছে যাওয়া বৃথা। এরা ফুরিয়ে গেছে।

আমার নিজের বিশ্বাস অবশ্য ঠিক তা নয়। আমার মনে হয় প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অবক্ষয় উপস্থিত হয়েছিল। তাই মুসলমানকে তার প্রয়োজন ছিল যৌবনের জন্যে। যবন নিয়ে এলো যৌবন। আগেও একবার এনেছিল মুসলমান রূপে নয়, গ্রীক রূপে। পরেও আবার নিয়ে এলো ইংরেজ রূপে। যৌবন বার বার এসেছে। অবক্ষয় বার বার প্রতিহত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জা ভারতবর্ষেরই। একে হিন্দু বললে অবক্ষয়কেই সনাতন বলা হয়। কারণ অবক্ষয়ের পূর্বে এর নাম হিন্দু ছিল না। এর রূপও হিন্দু ছিল না। অজন্তার সঙ্গে এর মিল কোথায়? গান্ধার শিল্পের সঙ্গে?

মহেন্‌জো দড়োর সঙ্গে ? যা সনাতন তা হিন্দু নয়। যা হিন্দু তা সনাতন নয়। হিন্দু মুসলমানের লড়াইটা ভূতের সঙ্গে ভূতের লড়াই। হিন্দুর মতো মুসলমানেরও অতীত আছে, ভবিষ্যৎ নেই। থাকলে নিতান্তই স্থূল অর্থে। স্থূলের দ্বারা সূক্ষ্ম সৃষ্টি হয় না। আর্ট হচ্ছে সূক্ষ্ম সৃষ্টি। কিন্তু ভবিষ্যৎ আছে ভারত আত্মার। যদি তার সংস্কারমুক্তি ঘটে। যদি সে দশভুজার মতো দশদিকে দশ হাত বাড়ায়। পূর্ব পশ্চিম ভেদজ্ঞান না রাখে। হিন্দু মুসলমান ভেদবুদ্ধি না পোষে।

মেসোমশায়ও ভিতরে ভিতরে ছটফট করছিলেন। বাইরে যদিও শান্ত সমাহিত। মালার জন্যে অবশ্য। তবে শুধু মালার জন্যে নয়। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "পঞ্চাশ বছর বয়সের পর মানুষ বাঁচে তার কাজের জন্যে। তার কাজ থেকে তাকে বঞ্চিত কর। দেখবে সে বেঁচে নেই। বেঁচে আছে তার শরীরটা।"

বাস্তবিক, কী নিয়ে তিনি থাকবেন ? চাকরি তো করবেন না। নিজের বাড়ীতে বসে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা ? তারও তো প্রবাহ রুদ্ধ। কবে দেশের সুদিন ফিরবে ! পার্ক সার্কাসে ফিরে যাবেন তিনি ! স্থানটি কত কাছে অথচ কত দূরে ! দিনটিও কত কাছে অথচ কত দূরে !

বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেই মাসিমা বলে ওঠেন, "ক্ষেপেছ ? ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায় ? শান্তিপ্রতিষ্ঠা হোক আগে। করবে ইংরেজ। যদি রাজত্ব রাখতে চায়।"

আমি কণ্ঠক্ষেপ করি। "আর যদি রাজত্ব না রাখতে চায়?"

"সে কী!" মাসিমার চমক লাগে। "এমন সোনার রাজত্ব কাকে দিয়ে যাবে! তুমিও যেমন। এ জিনিস কি প্রাণ ধরে কেউ কাউকে দেয়? ওরা দিয়ে যাবে না। আমরাই গায়ের জোরে কেড়ে নেব। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? হবে, সুভাষ যেদিন আসবে।"

মাসিমাকে শোনাই লাটভবনের কানাঘুষা। সেখানে মাঝে মাঝে যেতে হয় আমাকে। ইংরেজরা আগের চেয়ে অনেক বেশী দিলখোলা হয়েছে। ব্যবহারও তাদের অনেক বেশী ভদ্র। সমস্কন্ধের মতো। এই তো সেদিন শুনে এলুম, "ক্ষতিপূরণের বহর নিয়ে আপনাদের নেতাদের সঙ্গে দর কষাকষি চলছে। ঈজিপ্টের ওঁরা আমাদের অফিসারদের খুশি করে দিয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ার এঁরাও যদি খুশি করে দেন তা হলে আমরা কালকেই জাহাজ ধরতে রাজী। ঢের হয়েছে রাজাগিরি। হাতে রাখব সওদাগরি।"

অরাজকতার প্রশ্ন তুললে ইংরেজ আলাপীরা বলেন, "এসব দাঙ্গাহাঙ্গামার আসল কারণ তো এই যে ইণ্ডিয়ানরা ভাগ না দিয়ে ভোগ করতে চায়। নিজেদের মধ্যে ইণ্ডিয়ার লোক যা হয় একটা মীমাংসা করুক। যে মীমাংসা তারা করবে সেই মীমাংসাই আমরা মেনে নেব। কোনো পক্ষের উপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে যাব না।"

· ইংরেজদের ধন্যবাদ যে তাদের ভাষায় আমরা সবাই

ইণ্ডিয়ান। আর আমাদের সকলের দেশ ইণ্ডিয়া। কায়দে আজম কিন্তু সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ইণ্ডিয়ান নন। তাঁর স্বদেশের নাম পাকিস্তান। এই যদি হয়ে থাকে তাঁর দলবলের মনের কথা তবে মীমাংসা হতে পারে না। মীমাংসার ভিত্তিই নেই। এটা হৃদয়ঙ্গম করে গান্ধীজী দিল্লী ছেড়ে নোয়াখালী চলে গেছেন সরাসরি আবেদন করতে দেশের ইসলামপন্থী জনগণের দরবারে। তারা যদি কবুল করে যে তারা ইণ্ডিয়ান তা হলে মীমাংসা হবে নেতায় নেতায় নয়, পার্টিতে পার্টিতে নয়, জনতায় জনতায়। কিন্তু তারাও যদি কায়দে আজমের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করে তবে মীমাংসার শেষ ভরসাটুকুও লুপ্ত হবে। নোয়াখালীতে মহাত্মা গেছেন নিশ্চয় করে জানতে ইসলাম যাদের ধর্ম ইণ্ডিয়া কি তাদের দেশ, না দেশ নয় ? ইণ্ডিয়ান কি তারা জাতিতে, না ইণ্ডিয়ান নয় ?

মেসোমশায় হঠাৎ বলে বসলেন, "আমিও নোয়াখালী যাব।"

"তুমিও নোয়াখালী যাবে!" মাসিমা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "কেন ? মেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে ? না শুধু একবার দেখে আসতে ?"

অবাক হলুম আমিও। ভাবলুম মালার জন্যে তার বাপের মন কেমন করছে। করবে না ? আমি কোথাকার কে! আমারি মন কেমন করছে।

"না। সে জন্যে নয়।" মেসোমশায় পরিষ্কার করলেন। "নোয়াখালী গেলে দেখা হবে বইকি, কিন্তু দেখার জন্যে

নোয়াখালী যাওয়া নয়। আর ঘরে ফিরিয়ে আনা তো মালার অনিচ্ছায় হতে পারে না। তার যেদিন ইচ্ছা হবে সে আপনি চলে আসবে।”

একটু থেমে বললেন, “ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে লণ্ডনে নয়, দিল্লীতে নয়, নোয়াখালীতেই। নোয়াখালীতে যদি আমরা সিদ্ধকাম হই তা হলে দিল্লীতেও আমরা ব্যর্থ হতে পারিনে, লণ্ডনেও আমাদের নিষ্ফলতা ঘটবে না। আর নোয়াখালীতে যদি আমরা অকৃতকার্য হই তা হলে দিল্লীতেও আমাদের অক্ষমতা ঢাকা থাকবে না, লণ্ডনেও সেটা ধরা পড়ে যাবে। শেষ সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে নোয়াখালীর উপর। সে যেদিকে ইঙ্গিত করবে দিল্লী সেই দিকেই চলবে, লণ্ডন সেই দিকেই হেলবে।”

“সব মানলুম। কিন্তু তুমি কেন?” মাসিমা ভুললেন না। ভবী ভোলে না।

“আমি কেন?” মেসোমশায় বললেন, “কলকাতায় আমি কার কোন্ কাজে লাগছি? কলকাতা এখন মফঃস্বল। নোয়াখালী এখন সদর। ভারতের ভাগ্য তো দূরের কথা, বাংলাদেশের ভাগ্যও এখন কলকাতার হাতে নয়। কলকাতাই বা কার কোন্ কাজে লাগছে? অসতো মা সদ্গময়। আন্রিয়ালিটি থেকে আমাকে রিয়ালিটিতে নিয়ে যাও। কলকাতা থেকে আমাকে নোয়াখালীতে যেতে দাও। যাই, দেখি যদি কিছু করতে পারি। আমার দ্বারা বৃহৎ কিছু হবে

না, কিন্তু সামান্য কিছুও তো হতে পারে। রাম যখন সমুদ্রবন্ধন করেন কাঠবিড়ালীও নুড়ি বয়ে এনে সাহায্য করেছিল।"

মাসিমা তা শুনে লাল হয়ে গেলেন। তাঁর মুখে কথা জোগাল না। আমার দিকে তাকালেন। যেন আমিও তাঁর পক্ষে। আমি তাকালুম টোগোর দিকে। টোগো তাকাল নীলিব দিকে। আমাদের সকলের ভাবনা মেসোমশায়কে কী কবে নিবৃত্ত কবা যায়। মাসিমা কখনো তাঁকে যেতে দেবেন না। তিনি রক্তের চাপে ভুগছেন। তাঁকে যেতে দিলে বিপদ। ওদিকে তিনিও প্রায় মরীয়া হয়ে উঠেছেন। নোয়াখালী তিনি যাবেনই। তাঁকে যেতে না দিলেও বিপদ। নজরবন্দী করে তার মতো লোককে কাঁহাতক আটকিয়ে রাখা যায়! তাঁর উপর জোর খাটাতে গেলে ফল খারাপ হবে।

এ এক সঙ্কটময় পরিস্থিতি। মাসিমা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, "দেবপ্রিয়, এই সঙ্কটের জন্যে দায়ী তোমার বোন মালা। সে যদি অমন করে নোয়াখালী না যেত ইনিও যাবার জন্যে কোমর বাঁধতেন না। তোমার কি মনে হয় না যে মালাকে টেলিগ্রাম করে ফিরতে বলা উচিত?"

"কোন্ অজুহাতে, মাসিমা?" আমি তটস্থ হই।

"পিতার অবস্থা উদ্বেগজনক। এর মধ্যে মিথ্যা কোথাও আছে?" তিনি ভাষার দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নিলেন।

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলি যে মালা যদি টেলিগ্রাম পেয়ে বাড়ী আসে তো উদ্বেগের উপযুক্ত কারণ না দেখে আবার

চলে যাবে। সঙ্গে যাবেন তার বাবা। তার চেয়ে অনেক ভালো সত্যের মুখোমুখি হওয়া। মেসোমশায়কে যেতে দেওয়াই শ্রেয়। সাথী হবেন মাসিমা।

"আমি!" তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "তুমি হয়তো মনে করবে আমি ভীতু। প্রাণের ভয়ে যেতে নারাজ। কিন্তু তা নয়। আমার নজর সব সময় পার্ক সার্কাসের বাড়ীখানার উপরে। এইখানে বসেই আমি কড়া পাহারা দিচ্ছি। জানো, ও বাড়ীতে এখন টেলিফোন বসেছে। একদিন হয়তো মিলিটারিও বসবে। আমার বাড়ী আমি বেদখল হতে দেব না। নিজে ঢুকতে না পারি আর কাউকে ঢুকতে দেব না। কিন্তু আমি যদি কলকাতার বাইরে যাই বাড়ীটাও আমার নাগালের বাইরে যাবে। তোমার মেসোমশায়কে এ কথা বোঝায় কে? 'দেশ' 'দেশ' করে তিনি গেলেন। আচ্ছা, দেশ কি একটা নিরাকার বস্তু? দেশ হচ্ছে বাড়ী ঘর বাগান। দেশ হচ্ছে পনেরো কাঠা জমি। এই যদি গেল তো দেশ নিয়ে আমি করব কী, বল।"

এই পারিবারিক সঙ্কটে ডাক্তার বন্ধুরাও হার মানলেন। মেসোমশায় তাঁদের পরামর্শ কানে তুললেন না। বললেন, "গান্ধীর বয়স সাতাত্তর বছর। আমার বয়স ষাটেরও কম। তিনি তো শুনতে পাই পা দিয়ে নোয়াখালী চষে বেড়াচ্ছেন। বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে হাঁটছেন। আমি কি এতই অথর্ব! আমার কি এটা ইন্‌ভ্যালিড দশা!"

নয়

বড়দিনের সময় এক চিত্রপ্রদর্শনীতে নির্মলের সঙ্গে দেখা। এলাহাবাদ থেকে সে কলকাতা এসেছিল কী একটা কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে। মেসোমশায়ের ঠিকানা খুঁজে পায়নি। আমাকে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে আবিষ্কার করেছে।

পরিস্থিতির বিবরণ তাকে শোনাই। সে বলে, "উপায় যে নেই তা নয়। মাসিমা যদি অনুমতি দেন আমিই মেসোমশায়ের যাত্রাসহচর হব। তাঁর স্বাস্থ্যের খবরদাবি করার দায় আমার। তাঁর শরীরতত্ত্ব আমার অজানা নয়। নোয়াখালীতে গিয়ে তাঁর যদি ঘুরতে ইচ্ছা হয় আমিও তাঁর সঙ্গে ঘুরব। যদি এক জায়গায় থাকতে ইচ্ছা হয় আমিও তাঁর সঙ্গে থাকব। ছুটি ? ছুটি আমি যেমন করে পারি জোটাব।"

মাসিমার সামনে হাজির করে দিই তাকে। মাসিমা ভুরু কুঁচকিয়ে বলেন, "তুমি ডক্‌টরেট পেয়েছ বলে কি ডাক্তার হয়েছ ? অসুখবিসুখ করলে তুমি পারবে চিকিৎসা করতে ? ওষুধ পাবে কোথায় ওই পাণ্ডববর্জিত দেশে ?"

মেসোমশায় কিন্তু নির্মলের প্রস্তাব শুনে লাফিয়ে ওঠেন। রাতারাতি পরিকল্পনা তৈরি হয়ে যায়। মাসিমার প্রত্যেকটি আপত্তির খণ্ডন হয়। তিনিও হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, "যাচ্ছ, যাও। কিন্তু বেশী দিন থেকো না। শুনছি আবার

গোলমাল বাধবে নোয়াখালীতে। মালাকেও টেনে নিয়ে এসো।"

একদিন নির্মলকে সঙ্গে নিয়ে মেসোমশায় নোয়াখালী অভিমুখে যাত্রা করলেন। শেয়ালদায় তাঁকে তুলে দিয়ে এলুম। বিদায়কালে বললেন, "এ কাজটা আমার কাজ নয়। তবে যাচ্ছি কেন? যাচ্ছি এইজন্যে যে, নাই কাজের চেয়ে কাণা কাজও ভালো। এখন আমার সত্যি বাঁচতে ইচ্ছে করছে।"

লক্ষ করলুম শুধু বাঁচতে নয়। নাচতেও। মেসোমশায় ইউরোপীয় পোশাক পরে যেন নেচে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে বয়সের তুলনায় ছোট দেখাচ্ছিল। কে বলবে যে তিনি একজন ইনভ্যালিড! অথচ তাই হতো তাঁর দশা আরো কিছুদিন বেকার বসে থাকলে। পরের বাড়ী নজরবন্দী হয়ে পড়ে থাকলে।

এ মানুষ যে খুব শীগগির নোয়াখালী থেকে ফিরবেন আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত নই। কিন্তু কাউকে মুখ ফুটে বলিনে এ কথা। পাছে মাসিমা দুঃখ পান। তাঁর ধারণা মানুষ বাঁচে ডাক্তার দেখালে আর ইনজেকশন নিলে আর ওষুধ খেলে। কিন্তু তাঁকে দোষ দিয়ে কী হবে? স্বামীকে যেতে দিলে কী নিয়ে তিনি থাকবেন? তাঁরও তো একটা অবলম্বন চাই। যা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। বাঁচা তো কেবল টিকে থাকা নয়।

মাসিমা এর পরে এক দারুণ দুঃসাহসিক কাজ করেন। সোজা গিয়ে নিজের বাড়ীতে ওঠেন। সেইখানেই বাস করতে

থাকেন। অগত্যা আমাকেও প্রাণ হাতে করে তাঁর ওখানে যেতে হয়। যখনি যাই দেখি মাসিমার বাড়ীর ফটকে এক সশস্ত্র গুর্খা খাড়া পাহারা দিচ্ছে। আর একটা গুর্খা খাটিয়ায় শুয়ে বিশ্রাম করছে। তার পাশে শুয়ে আছে তার হাতিয়ার। গুলীভরা রাইফেল। দেখলে গা ছমছম করে।

মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করি, "এসব তো আগে দেখিনি। কবে লাইসেন্স নিলেন? মুসলিম লীগ সরকার কি হিন্দুকে লাইসেন্স দেয়?"

মাসিমা একটু হাসেন। বলেন, "গুণ্ডাদের কে লাইসেন্স দিয়েছে? এত হাতিয়ার তারা পায় কোথায়? যত কড়াক্কড় কি শুধু ভদ্র গৃহস্থের বেলায়? গুণ্ডার বিরুদ্ধে গুর্খা লাগিয়ে দিয়েছি। ওদের হাতিয়ার ওরাই যেখান থেকে হোক জুটিয়েছে। আমি চোখ বুজে রয়েছি। টাকা চায়, টাকা দিই। এও একরকম ট্যাক্স। গুর্খাকে না দিলে গুণ্ডাকে দিতে হতো। আগেকার দিনে একটাই গবর্নমেণ্ট ছিল। এখন একজোড়া গবর্নমেণ্ট। একটা সরকারী। আরেটা বেসরকারী। দু'দিন সবুর কর। দেখবে দেশে একটা প্রাইভেট আর্মি গড়ে উঠবে। অস্ত্রশস্ত্র ঘরে ঘরে তৈরি হবে। বোমা একদিন আমিই বানাব। এ বাড়ী কি আমি অমনি ছেড়ে দিচ্ছি?"

কী পরিমাণ মরীয়া হলে মানুষ এমন কথা মুখে আনে! বিশেষত হিন্দুর মেয়ে! আমি বিমূঢ় হয়ে শুনি। প্রতিবাদ বা সমর্থন কোনোটাই করিনে।

মাসিমা বলে যান, "বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' পড়েছ? মুসলমানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হিন্দুর ছেলে, হিন্দুর মেয়ে সেদিন কী করেছিল? ইংরেজ এসে সুশাসনের আশা দেয়। ইংরেজকে বিশ্বাস করে আমরা আমাদের হাতের অস্ত্র ইংরেজের হাতে তুলে দিই। ইংরেজ এখন আমাদের রক্ষা করতে অক্ষম। তা হলে রক্ষা করবে কে? মুসলমান? সেই তো প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূত্রধার। আবার 'আনন্দমঠে'র দিন আসছে। গান্ধীজীর অহিংসা কোনো কাজে লাগবে না। তার মহিমা এই গুণ্ডার দল বুঝবে না। নোয়াখালীর বেণাবনে মুক্তা ছড়ালে কী হবে!"

কলকাতা শহরে অকস্মাৎ অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য লক্ষিত হলো। টোগোকে জিজ্ঞাসা করলে সেও হাসে। বলে, "কোন্‌টা তোমার চাই? পিস্টল? রিভলভার? রাইফেল? স্টেনগান? কত টাকা খরচ করতে রাজী? কাল রাত বারোটার সময় ঘরে বসে পাবে। কোন্‌খান থেকে আসবে জানতে চেয়ো না।"

এই বলে টোগো দুই পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দেয়। সে সুরক্ষিত।

দেখলুম হাতিয়ার চাইলেই পাওয়া যায়। অফুরন্ত সরবরাহ। লাইসেন্স অবশ্য দুর্লভ। কিন্তু কেউ তার অপেক্ষায় বসে নেই। পুলিশ যথারীতি হানা দেয়, খানাতল্লাসী করে, কিন্তু পুলিশের লোকই দয়া করে জানিয়ে দিয়ে যায় যে হানাদার আসছে, খানাতল্লাসী হবে। হাতী ঘোড়া পার হয়ে যায়।

ধরা পড়ে চুলোপুঁটি। স্টেনগান যার হাতে আছে তার কাছে ঘেঁষবে কে? ওই গাদা বন্দুক কি ছোরা উদ্ধার করে। যোদ্দা কথা হিন্দুব স্বার্থ নয় হিন্দুকে নিরস্ত্র করা, মুসলমানের স্বার্থ নয় মুসলমানকে নিরস্ত্র করা। ইংরেজেব স্বার্থে তো কেউ বাদ সাধছে না, তাই ইংবেজেবও স্বার্থ নয় কাউকে নিরস্ত্র করা।

দেশ চলেছে গৃহযুদ্ধের অভিমুখে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী হইনি। এবাব ভারতের গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী হব। মনটাকে সেইভাবেই প্রস্তুত কবতে আরম্ভ কবি। কিন্তু আমার কাজ অসি দিয়ে নয়। তুলি দিয়ে। তবে তুলি ধবার জন্যেও তো বেঁচে থাকা চাই। বেঁচে থাকার জন্যেও কি অসি ধরতে হবে? পাব কোথায়? কী ভাবে? টোগো যেখানে পেয়েছে। যে ভাবে। চিন্তান্বিত হই।

এমন সময় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে মিটমাট করুক আব নাই করুক আটচল্লিশ সালের জুন মাসের মধ্যে ইংরেজ এ দেশ থেকে অপসরণ করবে। আমার কাছে এই সম্ভাবনাটা নতুন নয়। এই তারিখটাই নতুন। ইংরেজ তা হলে সত্যি সত্যি চলল। তার যাত্রা শুভ হোক। মনটাকে সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষমুক্ত করি। ইংরেজ বন্ধুরা দেখি পরম আশ্বস্ত। চার দিকের বিশৃঙ্খলার দায়িত্ব বইতে তাদের আন্তরিক অরুচি। ক্ষমতার বদলেও না। তারাও নতুন করে জীবন পত্তন করতে চায়।

মেসোমশায় ইতিমধ্যে ফিরেছিলেন। মাসিমা একদিন

আমাকে একটা বিচিত্র বার্তা শোনালেন। বললেন, "দেখ, দেবপ্রিয়, নোয়াখালীর সমস্যা আজকের নয়। তোমার জন্মের আগের। লাট কার্জন বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। নোয়াখালী প্রভৃতি জেলা কলকাতা থেকে শাসন করা যায় না বলেই তিনি ঢাকা থেকে শাসনেব পরিকল্পনা করেন। বঙ্গবিভাগের সেইটেই ছিল প্রাথমিক কারণ। আবার যদি বাংলাদেশ দু'ভাগ হতো আর ঢাকা হতো পূর্ববঙ্গের রাজধানী তা হলে নোয়াখালী শাসন করা সুগম হতো কি না তুমিই বল। যেটা কলমের এক খোঁচায় হতে পারে সেটার জন্যে মহাত্মাকেই বা অমন ভীষ্মের মতো পণ করতে হয় কেন? মালারই বা অমন তপস্যায় কাজ কী? আর ইনিই বা কেমন করে আমাকে বিপদের মুখে ফেলে অত দিন ওখানে থাকেন?"

বাংলা ভাগ করার এই অভিনব প্রস্তাব দেখতে দেখতে সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। সমস্যা যে অত সহজে মিটতে পাবে কারো মাথায় আগে এটা আসেনি। ইংরেজীতে একটি কথা আছে। হেরডকে আউট-হেরড করা। হেবডের উপর টেক্কা দেওয়া। তেমনি এটা হলো জিন্নাকে আউট-জিন্না করা। খোদার উপর খোদকারী করা। তুমি চল ডালে ডালে তো আমি চলি পাতায় পাতায়।

"দেখ, এর মধ্যে একটা মস্ত কূটনৈতিক চাল আছে।" আমাকে বোঝায় আমার রাজনীতিক বন্ধু হারানিধি লাহা। "বাংলা ভাগ হলে ওরা কলকাতা হারাবে। এটি একটি সোনার

খনি। ওদের দশা হবে মণিহারা ফণীর মতো। কিছুতেই ওরা রাজী হতে পারে না। ওরা যদি এতে রাজী না হয় আমরা কেন ওতে রাজী হব? আর ওরা যদি এতে রাজী হয় তা হলে আমরা কেন ওতে নারাজ হব? এসব গুণ্ডাদের পদ্মাপার করতে পারলেই বাঁচি।"

"ও পারের হিন্দুরা কি আরো বিপন্ন হবে না?" প্রশ্ন করি আমি।

"ওরা," হারানিধি অম্লানমুখে উত্তর দেয়, "এ পারে চলে আসবে।"

বাজিয়ে দেখলুম গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো মেরুদণ্ড একজনেরও নেই। গৃহযুদ্ধ যাতে না বাধে সেই কথা ভেবে আগে থেকেই সন্ধি করতে বুদ্ধিমানরা ব্যগ্র। সন্ধিব শর্ত পর্যন্ত তাঁদের জিহ্বাগ্রে। বাকী শুধু জিন্নাকে ঢেঁকি গেলানো। তার জন্যে দরকার ছিল মাউণ্টব্যাটেনের মতো এক ওস্তাদের। তিনি যা করলেন তা একপ্রকার অসাধ্যসাধন। হঠাৎ-নবাবদের কলকাতা ছাড়ার দিন ঘনিয়ে এলো।

সেই যে রাজেক হোসেন সাহেব বা রাজেনদা তিনি মেসোমশায়ের অনুপস্থিতিতে মাসিমার বাড়ী আসতে সাহস পেতেন না। যেই শুনলেন মেসোমশায় ফিরেছেন অমনি ছুটে এলেন দেখা করতে। তখনো মাউণ্টব্যাটেনের প্ল্যান পাকা হয়নি। মেসোমশায়ও বিশ্বাস করেন না যে পাকা হবে। তাঁর ধারণা গান্ধীজী ওটা উলটিয়ে দেবেন; যেমন দিয়েছিলেন

ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব। মাউণ্টব্যাটেনকেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে।

"ভাই অমল, এ কী শুনছি, ভাই?" রাজেনদা তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। "এ কী আবদার ধরেছিস তোরা? বাংলাদেশ ভাগ করতে হবে! এ কি কখনো ভাবা যায়!"

"তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, রাজেনদা।" মেসোমশায় অভয় দেন তাঁকে। "দেশ কিছুতেই ভাগ করা হবে না। না ভারতবর্ষ, না বাংলাদেশ। ইংরেজ যাচ্ছে, যাক। ওরা গেলে পরে আমরা যেমন করে পারি মিটমাট করব। মিটমাট না হলে তখন দেখা যাবে। নতুন আবহাওয়ায় নতুন করে ভাবা যাবে। আগে হাওয়া বদল।"

রাজেনদা যে খুব খুশি হলেন তা নয়। তিনি ইংরেজ থাকতেই মিটমাট চান। গান্ধী যেন জিন্নার দাবী মিটিয়ে দেন। চরম মহত্ত্ব দেখান। মুসলমান চিরবাধিত হবে। পাকিস্তান যে সব মুসলমানের মনের কথা তা নয়, কিন্তু সব মুসলমানেরই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আবার যেন তারা নতুন করে পরাধীন না হয়। তাদের শঙ্কা অমূলক হলে তারা কি এমন মরীয়া হয়ে উঠত? তাদের দিক থেকে এটা একটা জীবনমরণ সংগ্রাম। তারাও শান্তি চায়, কিন্তু স্বাধীনতার বিনিময়ে নয়। ইংরেজ যেদিন যাবে সেইদিনই তারা স্বাধীন হবে। নতুন করে পরাধীন হওয়া একদিনের জন্যেও নয়।

মেসোমশায় নোয়াখালী থেকে বিষণ্ণতর ও বিজ্ঞতর হয়ে

ফিরেছিলেন। মাসখানেক পদযাত্রার পরে। মুসলমানদের গৃহে অতিথিও হয়েছিলেন তিনি। বেদনার সঙ্গে বললেন, "মুসলমানরা নতুন করে পরাধীন হোক একটি হিন্দুর মনেও এ কামনা ভুল করেও ঠাঁই পায়নি কোনো দিন। স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যে সংগ্রাম চলে এসেছে তাতে হিন্দুও অংশ নিয়েছে, মুসলমানও অংশ নিয়েছে, শিখও অংশ নিয়েছে। যে স্বাধীনতা আসন্ন সে স্বাধীনতা আমাদের সকলেরই এজমালী স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পর যদি আমরা সবাই মিলে একে ভোগ করতে না পারি তবে সবাই একসঙ্গে বসে স্থির করব কেমন ভাবে ভাগ করলে সকলের সন্তোষ। সেটা হবে আমাদের ঘরোয়া বন্দোবস্ত। তাতে বিদেশী শাসকের হাত থাকবে না। ভালোবেসে যদি ধরে রাখতে না পারি তবে প্রেমের সঙ্গেই ছেড়ে দেব তোমাদের। তোমরা যদি পাকিস্তান চাও তবে আমাদের হাত থেকেই পাবে, তার সঙ্গে পাবে আমাদের শুভেচ্ছা। আমরাও সে পাকিস্তান রক্ষা করব, তার জন্যে জান দেব। কিন্তু ইংরেজের হাত থেকে নয়।"

রাজেক হোসেন সাহেব মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন। দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "না। না। তোদের হাত থেকে নয়। ইংরেজের হাত থেকেই। ওরাই যে আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল। ওরাই আমাদের হাতে ফিরিয়ে দেবে।"

মেসোমশায় তেমনি দৃঢ় স্বরে বললেন, "তা হলে ইংরেজের কাছেই চাও। গান্ধীজীর কাছে মহত্ত্ব প্রত্যাশা করছ কেন?"

রাজেক হোসেন নিরুত্তর। মেসোমশায় বলতে লাগলেন, "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রত্যাহার না করলে জিন্নার সঙ্গে গান্ধীর কথাবার্তার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। হিংসার কাছে নতিস্বীকার করার নাম অহিংসা নয়। গান্ধীজীর দেবার যা আছে তিনি দেবেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তুলে নিলে। ব্রিটিশ অপসরণের পরে। সেটা মহৎ দানই হবে।"

"না। না। তাঁর হাত থেকে দান আমরা চাইনে। তা সে যতই মহৎ হোক না কেন। ব্রিটিশ অপসরণের পরে দান নেওয়া মানে তো দাতার কাছে আগে অধীনতা স্বীকার করা। একদিনের জন্যেও তা করব না। মহত্ত্ব দেখাতে হলে তার সময় ব্রিটিশ অপসরণের পূর্বে।" বলে রাজেক হোসেন আসন ত্যাগ করলেন।

মেসোমশায় তাঁকে ধরে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমরা শুধু চাও গান্ধীজীর সম্মতি। দেবার মালিক ইংরেজ। কিন্তু ইংরেজ যদি তোমাদের আধখানা বাংলা দেয় নেবে?"

রাজেক হোসেন আমতা আমতা করে বললেন, "কী করে নিই?"

"নিয়ো না।" মেসোমশায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। "নেওয়া উচিত নয়। এটা একটা খারাপ চালের পাল্টা চাল। এটাও খারাপ। দুই খারাপে এক ভালো হয় না। এতে তোমাদেরও অমঙ্গল, আমাদেরও অমঙ্গল। আপাত লাভকে প্রকৃত লাভ বলে ভুল করলে আখেরে ঠকতে হয়। কাঁটা

একদিন গলায় বিধবেই। সেদিন হয়তো আমাদের জীবিত-কালে নয়। জাতি হিসেবে আমরা বাঙালীরা তৃতীয় শ্রেণীর হয়ে যাব। আমাদের সব স্বপ্নের, সব ধ্যানের সমাধি হবে। আমাদের হাত দিয়ে আর কোনো মহৎ সৃষ্টি হবে না। এ বেদনা আর কেউ বুঝবে না, বুঝবে শুধু তোমরা আর আমরা। উভয়ের উত্তরপুরুষ। ভাই রাজেনদা, বহু শতাব্দীতে এ রকম মুহূর্ত একবারমাত্র আসে। এটা আমাদের সত্যের মুহূর্ত। মোমেণ্ট অফ ট্রুথ। আমরা কি বরাবরের জন্যে দু'ভাগ হয়ে যাব? Whom God hath joined let no man put asunder."

এর উত্তরে রাজেক হোসেন কী বললেন শুনবে? বললেন, "সেইজন্যেই তো বলি, বাঙালী যেন ভাগ হয়ে না যায়, বাংলা যেন ভাগ হয়ে না যায়। পাকিস্তানেই আমাদের সকলের স্থান হবে। ভারতবর্ষ কতবার ভেঙেছে। আবার ভাঙলই বা!"

মেসোমশায় হাল ছেড়ে দিলেন। বললেন, "বাংলাকে ভালোবাসি বলে ভারতকেও কম ভালোবাসিনে। এক ভালো-বাসার খাতিরে আরেক ভালোবাসাকে ত্যাগ করতে পারি কখনো? যাদের অন্তরে প্রেম নেই তারাই ভাগ করতে পারে ভারতকে, বাংলাকে।"

"এই যদি হয় নির্যাস কথা তবে ইংরেজ চলে গেলেও তোমরা আমাদের পাকিস্তান দেবে না। বৃথা স্তোক দিয়ে আমাদের শেষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছ। তার চেয়ে ইংরেজ

অসহায়ের মতো কাঁদতে। তিনিও অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলেছেন। মানুষ একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে, 'ভাইজী। মহাত্মার কথাও তার প্রাণে পৌঁছয় না। কানে পৌঁছলেও তবু কাজ হতো। মহাত্মার সভায় আসবেই না। তিনি ঘরে ঘরে গিয়ে প্রেম দেন। তাও কি নেয়! অনেকগুলি মেয়েকেই আমরা উদ্ধার করেছি। কিন্তু যেই আমরা সরে আসব আর মিলিটারি সরে যাবে অমনি আরো অনেক মেয়ে বন্দিনী হবে। মালা যদি থাকতে চায় তাকে ওই বিংশ শতাব্দীর শেষদিন অবধি থাকতে হবে। আমি ততদিন থাকতে পারিনে। তবে আর-একজন থাকবেন।"

কৌতূহল দমন করতে পারিনে। জানতে চাই কে তিনি।

"আপনার বন্ধু নির্মলজী।" মনোরমার চোখ হাসে।

"ওঃ! তাই তো! ভুলে গেছলুম তাঁর কথা।" আমি গম্ভীরভাবে বলি।

মেসোমশায় ও মাসিমা দু'জনেই মালার জন্যে দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন। বিশেষত গান্ধীজী বিহারে চলে যাওয়ার পর থেকে। মনোরমা ছিল তাঁদের প্রধান ভরসা। তার স্থান নিল নির্মল। লক্ষ করলুম নির্মলের প্রতি মাসিমার অপার নির্ভরতা।

একদিন কথায় কথায় মাসিমা আমাকে বললেন, "তা একালের মেয়েরা যখন নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করবেই, গুরুজনের নির্বন্ধ মানবে না, তখন আমরাই বা কেন আপত্তি

করি? আপত্তি করলে শুনছে কে? আমি, বাবা, কাউকে বাধা দিতে চাইনে। একটিমাত্র মেয়ে। তাই আমি ভালো দেখে বিয়ে দিতে চেয়েছিলুম। এই আমার অপরাধ। এর জন্যে আমাকে ত্যাগ করে বনবাসে যাবার কোনো অর্থ হয়? গেল তো গেল। আর ফিরে আসার নামটি নেই। বাপের সঙ্গেও না। মনোরমার সঙ্গেও না। চিঠি লিখলে জবাব দেয়, আমি যদি যাই তবে একখানা টিকিটে কুলোবে না। কিছু না হোক শতখানেক মেয়ে আমার সঙ্গে যেতে চাইবে। কোন্ প্রাণে তাদের আমি পিছনে ফেলে যাই? তুমি তাদের কোথায় জায়গা দেবে বল?"

আমি আশ্চর্য হলুম। "আপনার বাড়ীতে জায়গা দিতে হবে এমন কী কথা আছে!"

"ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আমার এই হতভাগা বাড়ী। দেশ ভেঙে দিয়ে মুসলমানকে যদি বা হটালুম তো বাঙাল উড়ে এসে জুড়ে বসতে চায়। তাও একটি নয়, দুটি নয়, শতখানেক। বলি এদের পিণ্ডি জোগাবে কে!" মাসিমা সুধান।

"সেটা," আমি সন্তর্পণে বলি, "দেশ ভেঙে দেবার আগে দু'বার ভেবে দেখা উচিত ছিল আপনার। হিন্দুকে হিন্দু না পুষিলে কে পুষিবে?"

মাসিমা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, "বেশ, তা হলে এ বাড়ীও আমি বেচে দেব।"

একটু ঠাণ্ডা হয়ে আবার বলতে লাগলেন, "হাঁ, মালা আর

কী লিখেছে শুনবে? লিখেছে, মুসলমানরাও আমাকে ছাড়তে রাজী নয়। মুসলমানদের গ্রামশুদ্ধ লোক এসে আমার কাছে দরবার করে, সবাই যাক। আপনি থাকুন। যা করতে বলবেন তাই করব। সত্যি তাবা আমার কথা শোনে। তাদের কথা আমি কেমন করে না শুনি? হাঁ, জনাদশেক মুসলমান যুবক আমাব কাছে আরজ জানিয়েছে যে আমি যেদিন যাব সেদিন তাদেবও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। কলকাতা শহর তাবা দেখেনি। সেখানে গিয়ে কাজকর্ম করবে। খেটে খাবে। কাবো গলগ্রহ হবে না। এই নিরীহ প্রকৃতির মানুষগুলিকে আমি কেমন করে বোঝাই যে কলকাতায় মুসলমান আর নিবাপদ নয়? সেখানে খেটে খেতে চাইলেও ঠাঁই নেই। অধিকার নেই। তাই যদি হয় তবে কলকাতা ফিরে যাওয়া আমার হবে না। আমি অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করব।"

আমি বেদনা বোধ করি। বলি, "নিরীহ প্রকৃতির মানুষগুলির কোথাও কি ঠাঁই আছে? তা বলে মালা কলকাতা না ফিরে কতকাল ও মুলুকে থাকবে!"

"নিরীহপ্রকৃতির মানুষগুলি!" মাসিমা জ্বলে ওঠেন। "না, হিংস্রপ্রকৃতির বনমানুষগুলি! যাদের আমি এত কষ্টে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে যাচ্ছি তাদেরি ভাই বেরাদরদের উনি খাল কেটে শহরে ডেকে আনবেন। নয়তো অভিমান করে মোগলের মুলুকে থাকবেন। এখন আমি করি কী? কেমন

করে আমার মেয়েকে উদ্ধার করি? ও যদি ভালোবেসে কাউকে বিয়ে করতে চায় আমার দিক থেকে বাধা নেই, জেনো। শুধু জামাইটি মুসলমান না হলেই হলো।"

মাসিমার উদারতায় আমি চমৎকৃত হই। এটা কি স্বাধীনতার হাওয়া গায়ে লেগে? না ভাঙনের দৃশ্য দেখে? আঘাতে প্রতিঘাতে দেশ যদিও জর্জর প্রগতির রথচক্র অবিরাম ঘর্ঘর রবে ছুটে চলেছে।

দেশবিভাগেব অভাবনীয়তায় হিন্দুবা যত না স্তম্ভিত প্রদেশ-বিভাগেব অকল্পনীয়তায় মুসলমানরা ততোধিক। পাকিস্তানের খড়্গ তবু সাত আট বছর ধরে মাথার উপর ঝুলছিল, কিন্তু পশ্চিম বাংলাব বজ্রটি অকস্মাৎ আসমান থেকে পড়ল। মুসলমানরা একবার মুর্শিদাবাদের তখ্‌ত হারিয়েছিল। এবার হারালো কলকাতার গদি। এমনিতেই তাদের মন খারাপ। তার উপর শোনা গেল পনোরোই অগাস্টের দিন হিন্দুরা দেখে নেবে। যার সঙ্গে দেখা হয় সেই বলে, "দাঁড়ান, মশায়। ক্ষমতাটা একবার আসুক হাতে। এমন শিক্ষা দেব যে চিরদিন মনে থাকবে।" আমি শিউরে উঠি।

ভয়ানক এক ট্র্যাজেডী ঘটে যাবে চোখের উপর। প্রথমে কলকাতায়। তার পরে তার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গের যে-কোনো জায়গায়। খুব সম্ভব নোয়াখালীতেই আবার। মালার জন্যে অস্থির বোধ করি। মুসলমানরা যে তাকে ছাড়তে চায় না এর মানে কি এই যে মালা তাদের হস্‌টেজ? তাকেই

তারা নির্যাতন ও হত্যা করবে? হা ভগবান! কেমন করে ওকে নোয়াখালী থেকে পনেরোই অগাস্টের আগে টেনে বার করে আনি? বিপদের কথা শুনে ও যদি উলটে কঠিন হয়? যদি বলে, "বিপদ যদি আসে তা হলেই জানব যে মায়া-পাহাড়ের পথে চলেছি। কোনো দিকে দৃক্‌পাত করব না। পিছন ফিরে তাকাব না। সোজা এগিয়ে যাব তীরের মতো। বীরের মতো।"

রাজেক হোসেন সাহেব একদিন আমাকে তাঁর মর্মবেদনা জানালেন। তিনি সপরিবারে ঢাকা চলে যাচ্ছেন। বললেন, "পশ্চিমবঙ্গ কবে থেকে বাংলাদেশ হলো? সে তো পাঠান মোগলদের আমলেই। সাত শ' বছর ধরে যাকে আমরা সৃষ্টি করেছি, লালন করেছি, ঐক্য দিয়েছি, নাম দিয়েছি তাকেই তোমরা আজ কলমের এক খোঁচায় দু'খানা করে দিলে। পাকিস্তানের এতদিন কোনো যৌক্তিকতা ছিল না। এখন হলো।"

আমরা দু'খানা করে দিয়েছি! তার মানে আমিও! "না, সার," আমি প্রতিবাদ করে বলি, "আমি এর মধ্যে নেই। সারা ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু, এই তথ্যটাই একদল ভারতীয়ের বরদাস্ত হলো না। তেমনি বাংলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু এ তথ্যটাও একদল বাঙালীর সহ্য হলো না। তথ্য দুটোকে উলটিয়ে দিতে না পেরে তারা তথ্যের থেকে পলায়নের পন্থা খুঁজে বার করল। কলমের এক খোঁচায় ভারত হলো

হু'খানা। সেই একই খোঁচায় বাংলাদেশও হু'খানা হলো। কলমের খোঁচায় হয়েছে বলেই রক্ষা। নয়তো তলোয়ারের খোঁচায় হতো। হতোই এটা ধ্রুব।"

মেসোমশায়ের ইচ্ছা নয় যে রাজেনদারা পাঠান আমলের ভিটেমাটি ছেড়ে পূর্ববঙ্গে প্রস্থান করেন। তা শুনে রাজেক হোসেন বলেন, "বাড়ীর মেয়েদেরও ইচ্ছে নয়। কলকাতার মতো স্বাধীনতা ঢাকায় কোথায়? বাড়ীর ছেলেদেরও ইচ্ছে নয়। পশ্চিমবঙ্গের মতো সভ্যতা পূর্ববঙ্গে কোথায়? বুলি আলাদা, খানা আলাদা। তবু যেতে হবে। হিন্দুস্থানে আমাদের অতীত আছে, ভবিষ্যৎ নেই। আমরা অনধিকারী।

মেসোমশায় যতই বোঝাতে যান কিছুতেই তিনি বোঝেন না। বলেন, "ওসব কে বিশ্বাস করে? ইণ্ডিয়া সেকুলার স্টেট! তাই যদি হবে তো পনেরোই আগস্ট আমাদের মেরে সাবাড় করার আয়োজন চলেছে কেন?"

মেসোমশায় জানতেন না। মাসিমা জানতেন। তা শুনে মেসোমশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বলেন, "ওহে, তোমরা এখানে মাইনরিটি, কিন্তু ওখানে মেজরিটি। আমি যে সর্বত্র মাইনরিটি। টুর্গেনিভের উপন্যাসের সুপারফ্লুয়াস ম্যান। ফালতো মানুষ। আমি তা হলে কোথায় যাই! আমার মনে হয় গান্ধীজীও এখন সুপারফ্লুয়াস ম্যান।"

কিছুদিন পরে গান্ধীজী কলকাতা এসে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি সুপারফ্লুয়াস নন। পঞ্জাবের রক্তসিন্ধুর মতো রক্তগঙ্গা

বাংলাদেশে যে বইল না এর কারণ নোয়াখালীতে ও কলকাতায় তাঁর শান্তিব্রত। মালারও এতে সামান্য কিছু হাত ছিল। পনেরোই অগাস্ট হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান মাতালের মতো কোলাকুলি করে। আমি তো অবাক! আরেক দিন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল যখন একদল হিন্দু যুবক গিয়ে মহাত্মার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করল।

পনেরোই রাত্রে মাসিমাব ওখানে ছোটখাটো একটি ব্যাঙ্কেট। তাঁর বাড়ী তিনি এবার নিষ্কণ্টক হয়ে ভোগ করতে পারবেন। এ যেন দ্বিতীয়বার গৃহপ্রবেশ। তফাতের মধ্যে একজনও মুসলমান অতিথি নেই। নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁরাই আসেননি। তার চেয়েও বড় তফাৎ—মালা নেই। তার অনুপস্থিতিটা সকলের চোখে বাজছিল।

মেসোমশায় স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। নিশ্চল পাষাণমূর্তি। সকলে একে একে বিদায় নিলে আমার প্রণাম নিয়ে বললেন, "এই দিনটির জন্যে সারা জীবন ধৈর্য ধরেছি। বেঁচে আছি বলে আমি ধন্য। ইন্দ্রত্বের জন্যে তপস্যা করিনি। ইন্দ্র যারা হতে চায় তারা হোক। আমি তপস্যা করেই মুক্ত। হাঁ, একটা মুক্তির স্বাদ আজ পাচ্ছি। আমার দেশ আজ মুক্ত। আমার দেশবাসী মুক্ত। তা হলে এই আনন্দের দিনে প্রাণভরে আনন্দ করতে কেন বাধছে? দেশ ভেঙে গেছে বলে কি? আবার জোড়া লাগতে কতক্ষণ? জুড়তে চাইলে ইংরেজ কি বাধা দিতে আসছে? কিন্তু গায়ের জোরে জোড়া

দেওয়া চলবে না। দিতে হবে প্রেমের জোরে। তেমন জোরালো প্রেম আজ তুমি ক'জনের মধ্যে দেখলে? কোলাকুলিকেই প্রেম বলে ভ্রম হতে পারে। সে ভ্রম ভাঙতে কতক্ষণ? প্রেম দিতে হলে প্রাণ দিতে হয়।"

পরিস্থিতি আবার অবনতির দিকে গেল। ভেবেছিলুম ভূতের লড়াই থেমে গেছে। একটুও না। পাঞ্জাবের খবর থেকে বোঝা গেল সমুদ্রমন্থনে শুধু অমৃত ওঠেনি, গরলও উঠেছে। এবং গরলেরই পরিমাণ বেশী। কে ওই বিষ কণ্ঠে ধারণ করবে? নীলকণ্ঠ হবে? দেবতারা সবাই তো সুধাপানে নিবিষ্ট। সে ওই গান্ধীজী। ভারতের ভাগ্য ভালো যে হলাহল পান করার জন্যে শিবও রয়েছেন।

শচীন মিত্র ও স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন শহীদ হন সেদিন চোখভরা জল নিয়ে মেসোমশায়ের কাছে ছুটে যাই। কথা বলতে গিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদি। তিনিও শোকে অভিভূত। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন নীরবে। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, "ওরাই আমার অরুণ বরুণ। আমি ধন্য। আমি ধন্য। আমি কৃতার্থ।"

অরুণ বরুণের পর তো কিরণমালা। মালাও কি এমনি করে আমাদের ছেড়ে যাবে? আমি চোখের জল রোধ করতে পারিনে। তিনি মনে করেন ওটা অরুণ বরুণের জন্যেই। আমিও গোপন করি। মালার জন্যে প্রাণটা হায় হায় করে ওঠে।

যা ভয় করেছিলুম তাই। মালা লিখেছে তার মাকে, "নোয়াখালী থেকে লাহোর যাচ্ছি। পথে একদিনের জন্যে কলকাতায় নামব। ভেবো না। বাবাকে দেখো। আমার সঙ্গে নির্মলদা যাচ্ছেন।"

রোদে ঝলসানো খসখসে মলিন মূর্তি। কোনো এক আধুনিক ভাস্করের হাতে গড়া। চুলে তেল পড়েনি কতকাল। গায়ে সাবান লাগেনি। স্নো পাউডার তো দূরের কথা। পায়ের পাতা ফেটে চৌচির। স্থলে স্থলে ক্ষতচিহ্ন। খালি পায়ে হাঁটা হয়েছে বোঝা যায়। খোস পাঁচড়ারও দাগ ছিল সেরে যাওয়ার পরেও।

মালার মা মেয়েকে দেখে থ। রুদ্র রূপ ধরে বললেন, "আমিও গান্ধীজীর মতো আমরণ অনশন করতে জানি। দেখি তুমি কেমন করে লাহোর যাও।"

তিনি সত্যি সত্যি খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিলেন। তা দেখে মেসোমশায়কেও একাদশী করতে হলো। তিথিটা যদিও সপ্তমী কি অষ্টমী।

মাসিমা বললেন, "আমি ঢের সহ্য করেছি। আর না। আমারি ভুল হয়েছিল তোমাকে মনোরমার সঙ্গে নোয়াখালী যেতে দেওয়া। ভেবেছিলুম দিন কয়েকের মধ্যে ঘুরে আসবে। তুমি যা করেছ আর কোনো মেয়ে আর কোনো দিন তা করেনি। আর কোনো মা তা করতে দেয়নি। ইংরেজের গাফিলতির দায় তোমাকে বইতে হবে কেন? আমরা কি

ট্যাক্স জোগাইনি যে তার বদলে বেগার দেব আর প্রাণে মরব? মেয়েদের তারও বাড়া বিপদ আছে। যমের হাত থেকে না হয় বাঁচলে। কিন্তু নরপশুর কবল থেকে? বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। জানো না? সীতার দেশের মেয়ে তুমি।”

মালা নিরুত্তর। তার মা তাকে তালাবন্ধ না করেও যা করলেন তা একরকম তাই। অনশনেরও সেই একই ফল হলো। মালা কলকাতায় থামল।

আর নির্মল? সেও বেঁচে গেল মালার জন্যে ভাবনা থেকে। তার প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। সে এলাহাবাদ ফিরে গেল। যাবার সময় আমাকে বলে গেল, “যত রটেছে তত ঘটেনি। তবু যা ঘটেছে তা সাংঘাতিক। এখন না ঘটলে পরে ঘটতই। তখন আমরা তাকে বলতুম শ্রেণীসংঘর্ষ। একদিকে শতকরা আশিজন চাষী, অন্যদিকে শতকরা আশি ভাগ জমি। কায়দে আজমকে ধন্যবাদ যে তিনি সেটাকে একটা সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করতে দিলেন না। এর ফলে হয়তো শ্রেণীসংগ্রামের মাজা ভেঙে গেল। হিন্দু-মুসলমান চাষী-মজুর একজোট হয়ে আর কোনো দিন লড়তে পারবে বলে মনে হয় না। লড়তে গেলে কোমরে জোর পাবে না। একদিন অনুতাপ করতে হবে।”

এক বছরের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ত্রিশ বছরের কাজ মাটি করে দিয়ে গেল। রুশ বিপ্লবের পরবর্তী ত্রিশ বছরের ঘড়ির কাঁটা

ঘুরিয়ে দিয়ে গেল। শ্রমিক কৃষকদের দিক থেকে এই। আর জাতীয়তাবাদীদের দিক থেকে? সেদিক থেকে জাতির অঙ্গহানি। আর অহিংসাবাদীদের দিক থেকে? সেদিক থেকে স্বয়ং গান্ধীজীরই মোহভঙ্গ। জনগণ প্রস্তুত নয়।

দশ

মালার মন থেকে কিছুতেই যায় না যে মায়াপাহাড়ের অবস্থান পঞ্চনদীর তীরে। আর কয়েক কদম এগোলেই সেখানে পৌঁছনো যেত। সেই ক'টি পদক্ষেপ থেকে তার মা তাকে বঞ্চিত করলেন। তাই মুক্তা ঝরার জল আর সোনার শুকপাখী হাতের কাছে এসেও হাতের নাগালের বাইরে থেকে গেল।

এ কথা তো সে মাকে বাবাকে খুলে বলবে না। নোয়াখালী সে কেন গেল, সেখানে কী করে এলো তাও তাঁদের জানায়নি। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে সে গান্ধীজীর মতো শান্তিস্থাপনের ব্রতে নিযুক্ত ছিল। গান্ধীজী আপাতত সেখানে নেই বলে চলে এসেছে। গান্ধীজী এখন দিল্লীতে। পরে হয়তো লাহোর যাত্রা করবেন। তাই মালারও গতি সেইদিকে। তাঁদের কিন্তু সম্মতি নেই তাতে। পাঞ্জাবে যা ঘটেছে তা অমানুষিক। যেমন মুসলমান তেমনি শিখ কেউ কম মারেনি, কম ধরেনি, কম কাড়েনি, কম পোড়ায়নি। হিন্দুদের 'অবদান'ও নগণ্য নয়। তারাও কারো চেয়ে কম পালায়নি।

মেসোমশায় মালাকে বোঝান, "আমরা এখন ভিন্ন রাষ্ট্রের লোক। সীমান্তের অপর পারে আমরা যেমন অসহায় তেমনি অনধিকারী। তারাও কি এপারে যখন খুশি আসতে পারে?

লাহোর যাব বললেই তো যাওয়া হয় না। তা যদি হতো গান্ধীজী দিল্লীতে পায়চারি করতেন না। সবুর কর। অবস্থা শান্ত হোক। তার পর যাবে।”

তার পরে যাবার দরকার কী থাকবে? মানুষ বিপন্ন বলেই না যাওয়া? মালা আপনাকে বাঁচাতে চায় না। চায় পরকে বাঁচাতে। বিশেষ করে মেয়েদের উদ্ধার করতে। দু'পক্ষই নাছোড়বান্দা। যতক্ষণ এরা না ছাড়ে ততক্ষণ ওরা ছাড়বে না। যতক্ষণ ওরা না ছাড়ে ততক্ষণ এরা ছাড়বে না। দু'পক্ষই রাবণ।

আমিও তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। সে বুঝেও বোঝে না। রূপকথার জগতে সীমান্ত নেই। রাজপুত্র ঘোড়া চালিয়ে দেয় অবাধে। কিরণমালাকে সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়নি। মায়াপাহাড়ের মায়া সরকার আপত্তি করেনি। বোধহয় টের পায়নি। টের পেলে কি সোনার শুকপাখী বিনা মাশুলে পাচার করতে দিত?

“এটা রূপকথার জগৎ নয়।” আমি ধুয়ো ধরি।

“তা হলে এটা কিসের জগৎ?” মালা প্রশ্ন করে।

মামুলি উত্তর দিতে আমার বাধে। তলিয়ে দেখলে রহস্যের কূলকিনারা পাইনে। কোটি কোটি সূর্য তারা নীহারিকার দিকে তাকাই, যাদের শাদা চোখে দেখা যায় না সেইসব অণু পরমাণুর দিকেও। বাস্তব কি কেবল মানুষের ক্ষুদ্র সংসার-যাত্রা? এ বাস্তব কি দিন ফুরোলে অবাস্তব নয়? হাজার

হাজার বছর পরে আজকের বাস্তবের মূল্য কী? মূল্য যদি কারো থাকে তবে সে ওই রূপকথার।

"এটা কিসের জগৎ সে কি আমি এক কথায় বলতে পারি, মালা?" আমি সোজাসুজি উত্তর দিতে অক্ষম হয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলি, "একে প্রকাশ করতে হলে, অমর করতে হলে রূপকথার প্রয়োজন হয়, সঙ্কেতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এতে বাস করতে হলে, প্রাণ ধারণ করতে হলে রূপকথায় বা সঙ্কেতে কুলোয় না। তার জন্যে চাই বাস্তববোধ। পদে পদে খেয়াল রাখতে হয় যে এটা রূপকথার জগৎ নয়।"

উপদেশের মতো শোনায়। যে কোনো সংসারী বিজ্ঞলোক যে ভাষায় কথা বলে থাকেন। মালা বুঝতে পারে যে তাকে প্র্যাকটিকাল হতে বলা হচ্ছে। সে আপত্তি করে না। বলে, "বাস্তববোধ যদি আমার না থাকে তবে আমি তা অর্জন করতে রাজী। তা বলে যেটা আমার আছে সেটা কেন বর্জন করব? বার বার আশাভঙ্গ মোহভঙ্গ ঘটবে। তা সত্ত্বেও পদে পদে স্মরণ রাখব যে এটা রূপকথার জগৎ।"

মালা আমাকে দিনে দিনে তার মায়াপাহাড়ের অভিযান কাহিনী শোনায়। ঘটনাগুলোর যে অংশটা পার্থিব সে অংশটা আমি বাদ দিই। যেটুকু অপার্থিব সেটুকু নিই। তার সঙ্গে আর কিছু মেশাই, যেটা পার্থিবের দ্যোতনা জাগায়। এমনি করে মায়াপাহাড়ের অভিযানকাহিনী চিত্রে রূপান্তরিত হয়। নোয়াখালী চাক্ষুষ করিনি। তার জন্যে ছবি আঁকা আটকায়

না। আমি তো নোয়াখালীর বিবরণী সচিত্র করতে বসিনি। আমার পদ্ধতিটাও বাস্তবধর্মী নয়। তার জন্যে অন্য লোক আছে। তাদের বরাত দিলে তারা এমন চমৎকার করে আঁকবে যে মনে হবে যেন অবিকল নোয়াখালীর ঘরবাড়ী পথঘাট ধানক্ষেত মাঠ। আর একালের বর্গীর হাঙ্গামা। আর তারই মাঝে একটি পথচারী বৃদ্ধ। একালের বুদ্ধ।

না। আমার এসব ছবিতে অবিকল বলে কিছু নেই। সেইজন্যে সকলের ভালো লাগে না। সকলের জন্যে আমি বাঁ হাতে পোস্টার আঁকি। বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকি। তা দিয়ে আমার সংসার চলে। আর ডান হাতে আঁকি যা আমাকে অমর করবে। আমাকে না করুক আপনাকে অমর করবে।

মালা আমার ছবিগুলো দেখে বলে, "হাঁ। হয়েছে।"

এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে? এই তো রসবিচারের শেষকথা। আমি নোয়াখালীও দেখিনি, মালাও নই, অভিজ্ঞতাগুলোও আমার নিজের নয়। তবু যা এঁকেছি তা "হয়েছে"। অন্তত মালার চোখে।

মালাকে আমি ছবি দেখাতে দেখাতে একটু একটু করে ভুলিয়ে নিয়ে যাই লাহোরের পথ থেকে। সে আর বাড়ী ছেড়ে বাহির হবার কথা মুখে আনে না। বোধহয় মনেও আনে না। মাসিমা ও মেসোমশায় তাকে যেতে দেননি বলে সে আর অশান্ত বা বিমর্ষ নয়। মুক্তা ঝরার জল আর সোনার শুকপাখী আনা হলো না বলে বিষাদ বোধ করে না। অরুণ

বরুণ পাথর হয়ে গেছে, কত রাজ্যের রাজপুত্র পাথর হয়ে গেছে, তাঁদের জীবন দিতে হবে বলে ব্যাকুল বোধ করে না। এক কথায়, সে আর কিরণমালা নয়। সে মালা হয়ে গেছে।

তাই যদি হলো তবে আর রূপকথার রাজপুত্রের জন্যে প্রতীক্ষা করা কেন ?

একদিন ওকে নিরালায় পেয়ে এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করি আমি। ও চমকে ওঠে। আমি ওকে আরো বড় চমক দিই। বলি, "তোমার চোখের সামনেই একটা পাথর পড়ে আছে। সে রাজপুত্র না হলেও তুমি তাকে জীবন দিতে পারো। মুক্তা ঝরার জল তোমার ঝারিতেই আছে, মালা। সোনার শুকপাখী আছে তোমার দাঁড়েই। তুমি কি তাকে বাঁচাবে না ?"

মালা প্রথমটা বুঝতে পারেনি কার কথা হচ্ছে। কোন্ কথা হচ্ছে। বুঝল যখন তখন তার মুখে সিঁদুর লাগল। সে সলজ্জভাবে মুখ নত করল। তার পর মুখ তুলে চোখের কোণে তাকালো। তার পর আমাকে চমকে দিয়ে বলল, "তুমি রাজপুত্রই। রূপলোকের রাজপুত্র।"

তা হলে আর কী ? আমার আশা আছে। মালার সঙ্গে আর একটি কথাও না। সেই দিনই মাসিমার সঙ্গে দেখা করি। একটু গৌরচন্দ্রিকার পর নিবেদন করি যে আমি তাঁর কন্যার অযোগ্য পাণিপ্রার্থী।

"তুমি !" মাসিমা বিশ্বাস করতে পারেন না। "তুমি ! দেবপ্রিয় ! মালার—" তিনি শেষ না করে কেঁদে ফেলেন।

আমি তো ধরে নিয়েছিলুম যে তিনি পাদপূরণ করবেন এই বলে, "মতো মেয়ে কি বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা হবে!"

তা নয়। তিনি কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, "তুমি যে আমাদের কত বড় বন্ধু তা এই বিপদের দিনেই বুঝতে দিলে। ও মেয়ে কোন্ দিন না লাহোর চলে যায় সেই ভয়ে আমার চোখে ঘুম ছিল না। এ কি সত্যি! তুমি! দেবপ্রিয়! আশ্চর্য! কেন যে এ কথা কোনো দিন মনে হয়নি! কিসে তুমি কম! মালাকে বলেছ? সে কী বলে?"

এর পরে মেসোমশায়ের সঙ্গে কথা। মাসিমাই আমার হয়ে পাড়লেন। তিনিও তেমনি আশ্চর্য। তেমনি প্রীত। তেমনি সম্মত। আনন্দে আমাকে বুকে টেনে নিলেন।

আশ্চর্য হলো না শুধু একজন। সে আমার বোন নীলি। সে নাকি অনেক আগেই টের পেয়েছিল যে এইরকমই হবে। না হয়ে পারে না।

সম্প্রদান করলেন মেসোমশায় যথারীতি। কিন্তু সেইখানেই তাঁর কর্তব্য ফুরোল না। আমাদের দু'জনকে পাশে বসিয়ে তিনি নীরবে উপাসনা করলেন। মনে মনে কী বললেন, কাকে উদ্দেশ করে বললেন তিনিই জানেন। তিনিও ধ্যানস্থ, আমরাও তাই। আমি আমার রূপের দেবতাকে উদ্দেশ করে মনে মনে বললুম, এখন থেকে আমার পূজা তেমন ঐকান্তিক হবে না, প্রেমকে ভাগ দিতে হবে। কিন্তু তোমাকে যা উৎসর্গ করব তার মধ্যে এবার থেকে রসের সঞ্চার হবে, প্রেম মিশিয়ে দেবে রস।

বিয়ের পরে মালা আর আমি মধুমাস যাপনের জন্যে বেরিয়ে পড়ি।. কিন্তু পশ্চিমমুখো হতে আমার ভয়। পাছে মালা বলে বসে, "দিল্লী চল। গান্ধীজী এখনো সেখানে।" কিংবা "লাহোর চল। ক্রন্দনের রোল এখনো উঠছে।" তেমনি পূবমুখো হতেও সাহস হয় না। পাছে শুনতে হয়, "নোয়াখালী চল। যা শুরু করে এসেছি তা শেষ করা চাই।"

তাই দক্ষিণ মুখে যাই। পুরীর সমুদ্রতীরে ডেরা বাঁধি। প্রতিদিন সমুদ্রের স্বাদ নিই। আমার কতকালের সমুদ্র। একই সমুদ্র এ দেশে আর ও দেশে।

সেই মধুরতম দিনগুলিতে আমরা আর কোনো কথা ভাবিনি। ভাবতে চাইনি। ভাবতে দিইনি। খবরের কাগজ পড়িনি। রেডিওর খবর শুনিনি। লোকের সঙ্গে মিশিনি। আমরাই আমাদের সমাজ। চিঠিপত্র যারা লিখত তাদের বলা ছিল দেশের খবর যেন না দেয়। জানতুম সে খবর মালাকে আনমনা করে তুলবে।

আমাদের চারদিকে আমরা এক গজদন্তের মিনার গড়ি। সে মিনারে প্রেম আর শ্রম এই নামের এক যুগল বসতি করে। বাইরের জগৎ বাইরেই থাকে। ভিতরে প্রবেশ পায় না। সে তৃতীয় পক্ষ। মিনারে বসে আমি অনলসভাবে ছবি এঁকে যাই। মালা অনলসভাবে রাঁধে বাড়ে ধোয় মাজে ঝাড়ে মোছে সাজায় গোছায় কাচে। সময় পেলেই সেতার নিয়ে বাজায়। আমি কখনো শুনি, কখনো শুনিনে। আমাকে যে তন্ময় থাকতে

হয় হাতের কাজ নিয়ে। সেও একপ্রকার সঙ্গীত। তাকে শুনতে হয় চোখ দিয়ে আর চোখ ভরে। মালার সেতার যেমন আমার জন্যে বাজে তেমনি আমার তুলিও মালার জন্যে রঙের খেলা খেলে।

দুঃখের দিনে একটা মাস যেন একটা বছর। কিন্তু সুখের দিনে একটা দিনের মতো ক্ষীণ। দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়। মাস শেষ হয়ে আসছে দেখে আমি কাতর হই। কী যেন একটা হারিয়ে যাচ্ছে। তাকে ধরে রাখতে পারছিনে। মালা কিন্তু একটুও কাতর নয়। ও জানে যে সুখ ওরই নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। ও যদি না যেতে দেয় তবে যাবে না। যতক্ষণ না যেতে দেয় ততক্ষণ থাকবে। ওর কাছে মধুমাস শুধু প্রথম মাসটাই নয়। পরের মাসগুলোও মধুমাস। একটা ফুরিয়ে গেলেও আর একটা তার জায়গা নেয়। পরম্পরার ছেদ নেই। একটা হারিয়ে গেলেও আর একটা মেলে। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। আমি অকারণে কাতর হচ্ছি। "নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই ফাগুন তখনো যাবে না।" মহাকবি বচন। আহা! তাই যেন হয়!

বাইরে মহাসিন্ধুর অশান্ত কলরোল। কান বধির করে দেয়। আমাদের গজদন্তের মিনারে বসে আমরা প্রণয় গুঞ্জনের নিরালা পাই। মধুমাস হয়তো কোনো দিন ফুরোবে না। কিন্তু এই ঝড়ঝঞ্ঝার যুগে জীবন নিঃশেষ হয়ে যেতে কতক্ষণ!

যৌবন তো এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে এলো আমার। আমিও তাই ইচ্ছা,করেই বধির হই বহির্জগতের অশান্ত কলরোলের প্রতি। সে তার গর্জন নিয়ে থাকুক। আমিও আমার গুঞ্জন নিয়ে থাকি। আমি জানি যে আমি যেদিন নিঃশেষ হয়ে যাব সেদিনও এই ঝড়ঝঞ্ঝার যুগ বাইরে ফুঁসতে থাকবে। একবার পা টিপে টিপে পিছু হটবে, তার পর আবার বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মালাকে নিভৃতে কানে কানে বলি, "দুঃখ পেতে পেতে আমি সুখের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলুম। না দেখলে বিশ্বাস হতো না যে আমার অদৃষ্টে সুখ আছে। এখন আমি সুখের আস্বাদন পেয়েছি। আমার কিন্তু ভয় করছে। এত সুখ কি আমার কপালে সইবে!"

"ভয় কিসের! আমি তো থাকব বলেই এসেছি।" মালা আমার কানে কানে বলে। পাশাপাশি শুয়ে।

"কে জানে কোন্ দিন তুমি আবার রক্তের নদী আর হাড়ের পাহাড় দেখে উতলা হবে! বেরিয়ে পড়বে মরা রাজপুত্রদের বাঁচাতে। পাষাণের গায়ে মুক্তা ঝরার জল ছিটোতে। ভুলে যাবে যে যাকে রেখে যাচ্ছ সেও একটা পাষাণ। দুঃখ পেতে পেতে পাষাণ। তোমার কল্যাণে তার শাপমোচন হয়েছে। তোমার অভাবে আবার না পাষাণে পরিবর্তিত হয়।" আমি শঙ্কিত স্বরে বলি।

"না। আমি আর বেরিয়ে পড়ব না।" মালা আমাকে

অভয় দেয়। "আমি দেখে এসেছি ও পথে আরো পথিক আছে। আরো পথিক থাকবে। তাদের কেউ না কেউ মায়াপাহাড়ে পৌঁছবে। মুক্তা ঝরার জল আনবে। একদিন না একদিন পাথরের ঘুম ভাঙাবে। হয়তো নিকট ভবিষ্যতে নয়। হয়তো আমাদের জীবনে নয়। কিন্তু আসবে সেদিন। আসবে।"

ও যেন বিশ্বাস ও আশা মূর্তিমতী। অবিচল। অটল। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি। আর মনে মনে ধন্যবাদ দিই। আপনাকে। আমার এ সৌভাগ্য দেবতাদের ঈর্ষা না জাগালে হয়।

"মালা", আমি ওকে নিশ্চিন্ত হয়ে বলি, "আমরা দু'জনে যদি দু'জনকে সুখী করতে পারি তা হলে এমন কিছু করলুম যাতে জগতে সুখের অনুপাত বেড়ে গেল। তার ফলে জগতে দুঃখের অনুপাত কমে গেল। এ যেন অমাবস্যার রাত্রে একটি রংমশাল জ্বালানো। সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্যা হয়ে যায় দেয়ালী। ক্ষণকালের জন্যে হলেও আঁধার আলো হয়ে যায়। আমাদের সুখ আর-কারো সুখে বাদ সাধছে না। বরং আর-সকলের অজ্ঞাতে আর-সকলকে সুখী করছে। একটি পাথরকে প্রাণদানও প্রাণের সর্বতোবিস্তার।"

"আমি কিন্তু," মালা ভেবে বলে, "সুখী হলেই আরো বেশী করে অনুভব করি যে আমার মতো বহু মেয়ে অসুখী। তাদের অ-সুখ কি লেশমাত্র কমলো!"

"কমলো বইকি।" আমি নিশ্চয়তা দিই। "স্পষ্ট নয় যদিও। কমতেই হবে। না কমলে জগতের হিশাব মিলবে কেমন করে ?"

মালা মৃদু হাসে। "আমি কি অঙ্ক কষতে বিয়ে করেছি ? সুখী করতেই আমার আসা। সুখী না করে আমি যাচ্ছিনে। নিজে সুখী না হলেও তোমাকে সুখী করতে আমি যথাসাধ্য করব।"

"নিজে সুখী না হলেও ?" আমি অভিমান করি। "কেন সুখী হবে না তুমি ? আমি তা হলে কী করতে আছি ?"

"তুমি ?" মালা আমার হাতে হাত জড়িয়ে বলে, "তুমিও তোমার সাধ্যমতো করবে। তোমার চেষ্টা ব্যর্থ যাবে না। আমি সুখী হব। কিন্তু ঐ যে বলেছি। আমি সুখী হলে তো নোয়াখালীর মেয়েদের পাঞ্জাবের মেয়েদের অ-সুখ লেশমাত্র কমলো না। তাদের অ-সুখ আমার সুখকে লজ্জা দিতে থাকবে।"

আমি ব্যথা পাই। জগতে শয়তান আছে। তারা শয়তানি করবে। আমি তার কী করতে পারি! অভাগিনী মেয়েরা ভুগবে। আমি তার কী করতে পারি! মাঝখান থেকে মালা হবে অসুখী। আমার আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও অসুখী। হায়! এমন কোনো কৌশল আমার জানা নেই যা দিয়ে দুঃখিনীদের দুঃখ দূর করতে পারি। থাকলে আমি রাজা ক্যানিউটের মতো ঝড়ের সমুদ্রকে বলতুম, "সমুদ্র, তুমি

হটে যাও।” অমনি সমুদ্র যেত হটে। ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে যারা ঘায়েল হয়েছে তারা আবার উঠে দাঁড়াত। গায়ের বালি ঝেড়ে ফেলত। জল মুছে ফেলত। যেন কিছুই হয়নি। হায়! সমুদ্র হটবে না। ক্যানিউটকেই হটতে হবে।

মালার একটি কথায় আমার একটু আপত্তি ছিল। মুখ ফুটে জানাই, “সাধ্যমতো সুখী করতে যে কোনো পুরুষ পারে। আমি করব সাধ্যের চেয়েও বেশী। আমি করব অসাধ্যসাধন। তাতে যদি তোমাকে সুখী করতে পারি।”

মালা আমার হাতখানি টেনে নিয়ে মুখে ছুঁইয়ে বলে, “আমি তা বিশ্বাস করি। তবু তোমাকে বারণ করব সাধ্যাতীতের সোনার হরিণ ধরে আনতে। সীতার উচিত ছিল রামকে নিবৃত্ত করা। তা না করে তিনি প্রবৃত্ত করেন।”

আমার বুকটা কেঁপে ওঠে! তৃতীয় জনকে আমি বড় ভয় করি।

মালা বলে যায়, “তুমি মহৎ শিল্পী হবে। এটা পুরুষোচিত উচ্চাভিলাষ। আমি তোমাকে বাধা তো দেবই না, বরং তোমার সহায় হব। কিন্তু স্ত্রীকে সুখে রাখার জন্যে প্রাসাদ তৈরি করাই যদি লক্ষ্য হয় তবে সেটা অনুচিত উচ্চাভিলাষ। দাসদাসী দিয়ে ভরিয়ে দেওয়াও তাই। এর জন্যে যদি তুমি চোখ ধাঁধানো তসবির আঁকো আর মুঠো মুঠো মোহর পাও তা হলে তুমি আমার সমর্থন হারাবে।”

মালাকে সুখী করার জন্যে এসবই আমি পারতুম।

কিন্তু পারলে অসুখী হতুম। মালা আমাকে এর থেকে মুক্ত করে দিল'।

কলকাতা ফিরে আসার পর আমাদের নিজেদের সংসার শুরু হলো। আমার মা রইলেন আমাদের সঙ্গে। ভবানীপুরের বাসাটাতে একে জায়গা কম, তার উপর সেকেলে বন্দোবস্ত। মালার অসুবিধে হবারই কথা। তবু ও হাসিমুখে সহ্য করল। ওর মা ওকে বলেছিলেন তাঁর বাড়ীর এক অংশ ভাড়া নিয়ে নিজের ঘরকন্না পাততে। কিন্তু আমার মাকে সেখানে যেতে বলা যায় না। তিনি নারাজ হতেন। তাঁকে একা ফেলে রেখে আমাকে নিয়ে যেতে মালাও নারাজ।

প্রায়ই মাসিমা ও মেসোমশায়ের কাছে যাই। বলা উচিত শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও শ্বশুর মহাশয়। কিন্তু বলতে বাধে। এতক্ষণ যা বলে এসেছি তাই বলে যাচ্ছি। আর বেশী বাকীও নেই। মাসিমার মনে এখন নবীন উৎসাহ। আবার আগের মতো বুধবার-বুধবার পার্টি দিচ্ছেন। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সমাজকল্যাণও করছেন। নতুন গবর্নমেণ্টে তাঁর যথেষ্ট খাতির। সেই যে কবে অগাস্ট আন্দোলনের সময় ত্যাগস্বীকার করেছিলেন সেটা এতদিন পরে ডিভিডেণ্ড দিচ্ছে।

মেসোমশায় তেমনি চিন্তাকুল। মাসিমার মতে ওটা একটা রোগ। কেননা দেশ স্বাধীন হবার পর চিন্তার আর কী আছে? যেটা ছিল সেটা তো লঙ্কাভাগ করে মিটিয়ে দেওয়া গেল। কেন তা হলে অনর্থক মন খারাপ করা?

এই ভালো। ভাগ না দিয়ে যখন ভোগ করা যেত না তখন একভাবে না একভাবে ভাগ করতে হতোই। চাকরি ভাগ করতে হতো, দোকান ভাগ করতে হতো, কারখানা ভাগ করতে হতো, খামার ভাগ করতে হতো। তেমন ভাগাভাগির শেষ কোথায়? তার চেয়ে এই ভালো নয় কি? এর মধ্যে একটা চূড়ান্ততা আছে।

কলকাতাকে শান্ত করে গান্ধীজী নোয়াখালী রওনা হবেন এমন সময় ডাক এলো দিল্লী থেকে। যে মানুষের পূবমুখে যাবার কথা তাঁকে যেতে হলো পশ্চিমমুখে। সেখানে নোয়াখালীর বিপরীত সমস্যা। সংখ্যালঘু মুসলমান বিপন্ন। তাঁর মনে আশা ছিল তাঁর নিকটতম সহকর্মীরাই যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তখন তাঁদের ক্ষমতা তাঁর মিশনের সহায়ক হবে। দিল্লীতে সফলকাম হয়ে তিনি নোয়াখালীতেও সাফল্যের জন্যে পাথেয় সংগ্রহ করবেন। এক সমস্যার সমাধানে অপর সমস্যারও সমাধান হবে। সর্বত্র সংখ্যালঘু সুরক্ষিত হবে। রাষ্ট্রই সুরক্ষার দায়িত্ব নেবে। সংখ্যাগুরুই সদ্ব্যবহারের অঙ্গীকার দেবে।

কিন্তু মাসের পর মাস যায়। তাঁর মিশন অসমাপ্ত থাকে। তিনি দেখতে পান দেশ ভাগ হয়ে যাওয়াই চূড়ান্ত নয়। ভাগ হয়ে যাচ্ছে জনগণ। ভাগ হয়ে যাচ্ছে চাষী, কারিগর, মুদি, মজুর, ভিখারী। ভাগ হয়ে যাচ্ছে গরিব দুঃখী সর্বহারা। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে রাষ্ট্র কতবার [illegible] হয়েছে,

কিন্তু জনগণ বরাবরই অবিভাজ্য। তারা যদি স্বেচ্ছায় দু'ভাগ হয়ে যেত তা হলেও তিনি তাদের বুঝিয়ে নিরস্ত করতেন, কিন্তু এ যা হচ্ছে তা ছলে বলে কৌশলে। হতে পারে ওপারের ক্ষমতাশালীদের লক্ষ্য পাকিস্তানকে হিন্দুশূন্য করে একই ঢিলে ভারতকেও মুসলিমশূন্য করা, ভারতকে "হিন্দুস্থানে" পরিণত করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকেও পরাস্ত করা। কিন্তু এপারের এঁরাই বা ও খেলায় যোগ দিয়ে পরাস্ত হতে যান কেন? পরকে লক্ষ্যভেদ করতে দেন কেন? ভারত মুসলিমশূন্য ও পাকিস্থান হিন্দুশূন্য হলে চরম পরিণতি তো গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ ও গরুড়ের দ্বারা বিনাশ।

"ওহে দেবপ্রিয়," মেসোমশায়ই আমাকে সর্বপ্রথম খবর দেন, "শুনেছ? গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করেছেন। আমরণ অনশন।"

"হঠাৎ!" আমি আঁতকে উঠি। এই স্থবির বয়সে আমরণ অনশন!

"হাঁ। হঠাৎ।" মেসোমশায় উত্তেজিত হয়ে বলেন, "কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। পাকিস্তান খোলাখুলিভাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতরাষ্ট্রও যদি ভিতরে ভিতরে তাই হয় তবে জিন্নানেতৃত্বেরই জয় হলো। গান্ধীনেতৃত্ব রইল কোথায়! গান্ধীজীর বেঁচে থেকেই বা কাজ কী! তাঁর চোখের সামনে কোটি কোটি মানুষ উৎপাটিত হতে চলেছে। স্বাধীনতা কি তা হলে সর্বনাশ করার স্বাধীনতা? গান্ধীজী কি তা হলে দেশকে স্বাধীন করে দিয়ে আরব্য উপন্যাসের

দৈত্যকে জালার ভিতর থেকে ছাড়া দিয়েছেন ? এবার বুঝি সে তার মুক্তিদাতাকেই পেটে পুরবে ?”

আমি শিউরে উঠি। মেসোমশায় অস্থিরভাবে পদচারণ করতে করতে বলে চলেন, “দীর্ঘ যাত্রাপথের শেষপ্রান্তে এসে মহাত্মা দেখছেন প্রত্যূষে যেমন তিনি একা ছিলেন প্রদোষেও তেমনি একা। তাঁর সহযাত্রীরা এখন আর কোটি কোটি নয়, লক্ষ লক্ষ নয়, একটি কি দুটি। অহিংসাকে তো দুর্বলতা বলে দেশের লোক ছেড়েছে। বাকী থাকে সত্য। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে সত্যকেও বিপজ্জনক বলে ছাড়বে। ভারতের জনগণ যে ধর্মনির্বিশেষে এক এই সত্যটাকেও মুসলমানের সঙ্গে সঙ্গে মেরে খেদিয়ে দেবে। সত্য আর অহিংসা যদি না থাকে তবে গান্ধীজী থাকেন কী করতে ?”

“তা মুসলমানের আর এ দেশে বসবাস করার অধিকারটাই বা কিসের ?” মাসিমা বলেন গম্ভীরভাবে। “দেশ ভাগাভাগির দরকারটাই বা কী ছিল, ওরা যদি এ পারেই থেকে যাবে ও আবার আমাদের জ্বালাবে ? হিন্দু ও পারে টিকতে না পারলে মুসলমানকেও এ পারে টিকতে দেওয়া হবে না। গান্ধীজী অনশন করলেও না। সেন্টিমেণ্টাল না হয়ে দৃঢ় হতে হবে।”

এই মনোভাব থেকে আমার বন্ধুরাও মুক্ত নন। আমি নিজে মুক্ত, তার কারণ আমি বিহারের জন্যে অনুতপ্ত। আমার সে সময় খেয়াল ছিল না যে ভূতের লড়াইতে আমিও পরোক্ষ ভাবে পক্ষ নিচ্ছি। আমি চাই ভূত ছাড়াতে। হিন্দু ছাড়াতে

বা মুসলমান ছাড়াতে নয়। কিন্তু যা শুনছি দিল্লীর সরষের ভিতরেই ভূত। সরষেকে শুদ্ধ করতেই গান্ধীজীর অনশন।

মেসোমশায় মাসিমার কথা কানে না তুলে বলেন, "লবণ যদি তার লবণত্ব হারায় তা হলে তাকে লবণাক্ত করার কী উপায়? এই হলো মহাত্মার অনশনের অন্তর্নিহিত প্রশ্ন। অন্তত কতক লোককে ফিরে যেতে হবে মূলনীতিতে, যে মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে জগতের সমক্ষে, যাকে অনুসরণ করা হয়েছে স্বাধীনতার পূর্বে। পাকিস্তানের আলপিনের খোঁচা যদি আমাদের নীতিভ্রষ্ট করে তবে সামনে যে মহাযুদ্ধ আসছে, বিপ্লব আসছে, তার সঙীনের খোঁচার সম্মুখীন হব কী করে? জনগণ যদি আজকেই ভেঙে যায় তো কালকে প্রাচীর গড়বে কে? হিন্দু সৈন্য?"

মালা আমাকে পরে একদিন আড়ালে বলে, "দিল্লী যেতে এত ইচ্ছে করে, কিন্তু তোমাকে আমি কার হাতে দিয়ে যাব?"

"কেন?" আমি ওকে পরীক্ষা করি। "এতদিন আমি কার হাতে ছিলুম?"

"বিয়ের আগে কী ছিরি হয়েছিল তোমার! দিনমান কফি আর স্যাণ্ডউইচ খেয়ে স্টুডিওতে খাটলে শরীর থাকে!" মালা আমাকে শুনিয়ে দেয়। সত্যি। মালার হাতে পড়ে এরই মধ্যে আমার ওজন বেড়েছে। রংটাও মনে হয় এক পোঁচ ফরসা হয়েছে।

"বিয়ের পরে", আমি রঙ্গ করি, "সব মেয়েই সমান।

মায়াপাহাড় থেকে ফিরে কিরণমালাকেও বিয়ে থা করে স্বামীর জন্যে রাঁধতে হয়েছিল। স্বামীটি তো সেই বেপরোয়া রাজপুত্তুর যে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে এসেছে, তেপান্তরের মাঠে ঘোড়া ছুটিয়েছে। কোথাও তো লেখে না যে তার সঙ্গে রাঁধুনী ছিল বা সে দু'বেলা খেতে পেয়েছে। অথচ বিয়ের পর তারও দেখা যায় বৌয়ের হাতের পঞ্চাশ ব্যঞ্জন না হলে মুখে পলান্ন রোচে না।"

পরিহাসের কথা নয়। সত্যি আমার আশঙ্কা আমিও সেই রাজপুত্রের মতো একটু একটু করে অলক্ষিতে পোষমানা প্রাণী বনে যাব। যাকে বলে ডোমেস্টিকেটেড। সেটা আর কোনো মেয়ের হাতে না বনে মালার হাতে বনলে এমন কী সান্ত্বনা। শিল্পীরাও খেতে ভালোবাসে। কিন্তু তার জন্যে পোষ মানতে ভালোবাসে না। পোষ মানলে এমন কিছু হারায় যার ক্ষতিপূরণ নেই। মনের ভিতরে আমারও এই অভিলাষটি ছিল যে বিয়ের পরে আমিও যেমনকে তেমন থাকব। সেলিবেট নয়, ব্যাচিলার। আমার জীবনযাপনের ধরন ধারনের উপর বৌ এসে মুরুব্বিয়ানা ফলাবে না। পদে পদে জবাবদিহি চাইবে না। রেঁধে খাইয়ে তৃপ্ত করে দাসখৎ লিখিয়ে নেবে না। আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি খাবে না। অথচ মালা একটা দিন বাপের বাড়ী গেলে আমি চোখে অন্ধকার দেখি। বেশ বুঝতে পারি আমার সেই প্রচ্ছন্ন অভিলাষটি বিবাহের সঙ্গে বেখাপ। সেটিকে বিসর্জন দিতে

হবে। কিন্তু তা হলে আবার প্রশ্ন ওঠে, আমি শিল্পী থাকব তো ? না বিবাহের সঙ্গে বেখাপ বলে আমার শিল্পীসত্তাটিরও বিজয়াদশমী অনিবার্য ?

গান্ধীজী সে যাত্রা বেঁচে গেলেন। অনশনে তাঁরই জিত হলো। কিন্তু যাদের হার হলো তারা কেন তাঁকে বাঁচতে দেবে! গয়ায় পিণ্ডি না পাওয়া ভূতকে প্রমাণ করতে হবে যে তারই বয়স বেশী। সে-ই অধিকতর ভূত। মামদো তার কাছে সেদিনকার ছেলে। মামদো বড়জোর একজন গুণী-লোকের ঘাড় মটকাতে পারে, কিন্তু একজন মহামানবের বুকে বুলেট বসিয়ে দিতে তারও হাত উঠবে না। ব্রহ্মদৈত্য না হলে কার এত বড় স্পর্ধা হবে !

সে কালরাত্রি কি পোহাতে চায়। মালা মেজের উপর লুটিয়ে পড়ে সারা রাত কাঁদে ও কাঁপে। আমি ওর গায়ে একখানা কম্বল জড়িয়ে দিতে যাই। ও ঠেলে সরিয়ে দেয়। ও যেন কষ্টভোগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি পাহারা না দিলে মাথা খুঁড়ে রক্তপাত করত। এক পেয়ালা দুধও খাবে না। অগত্যা আমারও অনশন। ওই এক পেয়ালা দুধ বাদে। মা ঠাকুরঘরে ঢুকে রামধুন গুন গুন করতে থাকেন। তাঁরও সে রাত্রে একরকম লঙ্ঘন। শুয়ে শুয়ে আমি সারা ভারতের —সারা ভারতের কেন, সারা জগতের—বিয়োগব্যথা অনুভব করি। আর ভাবি শিল্পী কেমন করে এই অসীম শোককে সীমার মধ্যে এনে রূপ দেবে।

পরের দিন ও বাড়ীতে গিয়ে দেখি মাসিমা মেসোমশায় দু'জনেই অভিভূত। পাড়ার মুসলমানরা অনাথ অনাথার মতো তাঁদের ওখানে এসে নীরবে শোক জানিয়ে যাচ্ছে। মাসিমা উত্তেজনা দমন করে বলেন, "শুনেছ, দেবপ্রিয়? কাল রাত্রে অনেক হিন্দুর বাড়ী ভোজ হয়েছে। কেউ কেউ নাকি আগে থেকেই তৈরি ছিল। জানত।"

কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস। আমি ক্রোধে জ্বলি। কিন্তু চোখের জল ধরে রাখতে পারিনে। সারা রাত বাঁধ দিয়ে রোধ করেছিলুম। বৃথা হলো।

মেসোমশায়েরও রাত্রে ঘুম হয়নি। চোখ দুটো ফোলা ফোলা। লালচে। আমাকে পাশে বসিয়ে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ধরা গলায় বলেন, থেমে থেমে, "ইতিহাসে আমরা আগেও এ দৃশ্য দেখেছি। মানবপুত্র ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন আর পুরোহিতদের ঘরে ঘরে ভোজ চলেছে। এমন কি জনতাও তাদের দলে ভিড়ে আনন্দ করেছে। সেদিনকার সেই পাপের ফল এখনো ভুগতে হচ্ছে তাদের বংশধরদের। দেখে দুঃখ হয়। সে রকম দুর্ভাগ্য যেন আমাদের বংশধরদের না হয়। আজকের দিনে এই আমাদের প্রার্থনীয়।" তিনি ধ্যানস্থ হন।

আমরা সকলে মিলে প্রার্থনা করি। অবশ্য এই একমাত্র প্রার্থনীয় নয়। কাকে যেন উদ্দেশ করে মেসোমশায় বলেন, "জীবন তোমার সহায়তা করতে যতদূর পেরেছে ততদূর করেছে।

আর পারছিল না। এবার মৃত্যু তোমার সহায়তা করবে। তোমার কাজ একদিনও বন্ধ থাকবে না। এক মুহূর্তও না। তোমার কাজের মধ্যেই তুমি বেঁচে থাকবে। যে বাঁচায় সে-ই বাঁচে। প্রাণ দিয়ে তুমি প্রাণ দিলে। এ পারের লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভাইকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলে। ও পারের লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভাইকেও বাঁচালে। আমাদের চিন্তায় ও কর্মে, ধ্যানে ও রূপায়ণে তুমি বাঁচবে। আর কারো সাধ্য নেই যে তোমাকে মারে, তোমার গতি রোধ করে। হে পথিক, তুমি অগ্রসর হয়ে আমাদেরও অগ্রসর করে দাও।"

মেসোমশায় পরে একদিন বলেন, "হিন্দু মুসলমানের এ বিচ্ছেদও সত্য নয়, এ বিরোধও নিত্য নয়। সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক হবে না শুধু এই মহান ট্রাজেডী।"

মালার কান্না কি সহজে থামে! তবু প্রবলতম শোকেরও উপশম আছে। ও একটু একটু করে শান্ত হয়। ও যেন বহুদিনের অসুখ থেকে সেরে উঠেছে। ওর গায়ে এতদিন হাত দিইনি। আদর করি। সুধোই, "ওগো, তুমি কেন অতটা বিহ্বল হলে?"

"হব না!" ও বিস্মিত হয়ে বলে, "মায়াপাহাড়ের পথে যাদের রেখে এসেছি আর কি ওরা সে পথে এগিয়ে যেতে বল পাবে? একে একে ফিরে আসবে না?"

"তা হলে", আমি কৌতূহলী হই, "আবার স্বস্তি পেলে কী করে?"

"পেলুম এই কথা জেনে যে পথিকদের একজন এতদিনে মায়াপাহাড়ে পৌঁছে গেছেন। নিয়ে এসেছেন মুক্তা ঝরার জল। ছিটিয়ে দিয়েছেন পাথরের গায়ে। তার পর অদৃশ্য হয়ে গেছেন।" মালা বলে প্রত্যয়ের সঙ্গে।

আমি তার সরল বিশ্বাসে কৌতুক বোধ করি। বলি, "বাকী থাকে সোনার শুকপাখী। সেটি আনতে যাচ্ছে কে ?"

"সেটি ?" মালা আমার দিকে মধুরভাবে তাকায়। "সেটি আনতে যেতে হবে মায়াপাহাড়ে নয়। রূপলোকে। সেও এক মায়ার রাজ্য। সেখানে যাবে তুমি।"

"আমি! কী সর্বনাশ!" আমি চমকে উঠি। "সে কি সোজা রাস্তা! মালা! তুমি কি জানো না যে রূপলোকের মার্গও মায়াপাহাড়ের পথের মতোই বিপৎসঙ্কুল! ছায়ামূর্তিরা আমাকে ভয় দেখাবে। সোনার হরিণরা আমার লোভ জাগাবে। আমার প্রহরী হবে কে ?"

"আমি। আমি হব তোমার বিনিদ্র প্রহরী।" মালা আমাকে কথা দেয়।

"তার পর," আমি আকুল কণ্ঠে বলি, "সংসারের ধান্দায় আমি ভুলে যেতে পারি কে আমি, কী আমার লক্ষ্য। ওগো, তুমি কি আমাকে মনে করিয়ে দেবে ? তোমার নিজেরি মনে থাকবে তো ?"

"নিশ্চয়।" মালা প্রতিশ্রুত হয়। "সংসারের ধান্দা থেকেও যতটা পারি বাঁচাব।"

"তার পর," আমি চিন্তান্বিত হয়ে বলি, "মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে আমার প্রবৃত্তি নেই। কিন্তু অন্যায় যখন উদ্ধতভাবে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, নিরীহকে আঘাত করে, তখন আমি স্থির থাকতে পারিনে। ফলে বিপদ ডেকে আনি। দেবি, সে সময় তুমি কি আমার পাশে দাঁড়াবে?"

"তৎক্ষণাৎ।" মালা আমাকে ধন্য করে দেয়। "সৌন্দর্য আর আনন্দ আনতে যাচ্ছ বলে তুমি কি রাজপুত্র নও? রাজপুত্র হয়ে থাকলে রাক্ষসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধবেই। তুমি না চাইলেও আমিই তোমাকে দ্বন্দ্বে নামাব। আমি যে তোমার শক্তি।"

"অবশেষে," আমি মন খুলি, "আর একটি কথা। একার সাধনায় আমি রূপদক্ষ হতে পারি। কিন্তু রসবিদগ্ধ হব কী করে? তার জন্যে নিতে হয় নারীর কাছে দীক্ষা। তার জন্যে করতে হয় দু'জনায় মিলে যোগসাধন। সখি, তুমি কি আমাকে রসের দীক্ষা দেবে?"

মালা মৌন থাকে। সম্মতির লক্ষণ দেখে আমি ওকে কোলে টেনে নিয়ে সোহাগ জানিয়ে বলি, "প্রিয়ে, তবে তাই হবে। আমি যাব আনতে সোনার শুকপাখী।"

সমাপ্ত

শ্রীপঞ্চমী

৭ই মাঘ ১৩৬৭